ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬৩ বর্ষ ২১ সংখ্যা ।। ২৩ মাঘ, ১৪১৭ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১২) ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১ ।। Website : www.eswastika.com

রহস্যময়ী চীনা নাগরিক

ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার দক্ষিণ এশিয়া ও উত্তর-পূর্ব ভারতে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। রহস্যময়ী কুইং ওয়াং। ৩৮ বছর বয়সী অনৈক চীনা নাগরিক। তাঁর কার্যকলাপ এতটাই গোপন এবং সন্দেহজনক যে দুর্ভাবনা আর ভয়ে

কুইং ওয়াং– এই রহস্যময়ী চীনা নাগরিককে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে ষড়যন্ত্রের জাল।

ভারতীয় গোয়েন্দাদের ঘুম ছুটে যাবার যোগাড়। যতদূর জানা যাচ্ছে, দক্ষিণ এশিয়ায় বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব ভারতের নাগাল্যাণ্ডে এন এস সি এন-আই এম (ন্যাশানাল সোসালিস্ট কাউন্সিল অব্ নাগালিম— আইজ্যাক - মুইভা), মায়ানমারের কাচিন ইন্ডিপেনডেন্স আর্মি এবং নেপালের মাওবাদীদের মতো বিদ্রোহী ও জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে তাঁর। গত ২১ জানুয়ারি নাগাল্যাণ্ডের ডিমাপুরে আবশ্যিক রেস্ট্রিকটেড এরিয়া পারমিট না থাকার কারণে তাঁকে গ্রেপ্তার করেন ভারতীয় অভিবাসন দপ্তরের আধিকারিকরা। পরে আই জি আই বিমান বন্দর থেকে চাইনীজ ইস্টার্ন এয়ারলাইন্স (ফ্লাইট নং সি জেড ৩৬০) মারফত তাঁকে বেজিং-এর বাড়ি গুয়াংঝৌতে ফেরত পাঠানো হয়। অভিবাসন দপ্তর সূত্রে জানা যাচ্ছে, আই জি আই বিমানবন্দরে তাঁকে প্রায় ৩৬ ঘণ্টা জেরা করেন নিরাপত্তারক্ষীরা। কিন্তু প্রতিটি প্রশ্নেরই কৌশলী জবাব দিয়ে পার পেয়ে যান কুইং ওয়াং।

জানা গিয়েছে, নিজেকে কাঠ-ব্যবসার বিক্রয়-প্রতিনিধি এবং টিভি-সাংবাদিক হিসেবেও নিজের পরিচয় দিতেন তিনি। ডিসেম্বরের ১৭ তারিখ থেকে জানুয়ারির ২৫ তারিখ অবধি তাঁকে ট্যুরিস্ট ভিসা (নং- এ. এইচ ২২৮২৫০) দেওয়া হয়েছিল তাঁর পাসপোর্টের (নং- জি ৪৫৩৪৩৭০৯) ভিত্তিতে। এই ট্যুরিস্ট ভিসায় কুইং রাজধানী দিল্লী সহ জয়পুর, মুম্বাই এবং ব্যাঙ্গালোরে ঘুরতে পারতেন। এর সুযোগ নিয়েই এই রহস্যময়ী চীনা নাগাল্যাণ্ডের বিচ্ছিন্নতাকামী নেতা তথা নাগালিম গঠনের প্রবক্তা এবং এন এস সি এন-আই এম-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা থুঙলাং মুইভার সঙ্গে নয়াদিল্লীতে প্রায় চার-ঘণ্টা বৈঠক সারেন কুইং ওয়াং। এরপর তিনি ঘুরে আসেন নাগাল্যাণ্ডেও।

(এরপর ৪ পাতায়)

গত ৩০ জানুয়ারি হাসনাবাদে স্বয়ংসেবকদের সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন প্রাক্তন আর এস এস প্রধান কুপ্পহল্লী সীতারামাইয়া সুদর্শন। (খবর ভেতরে)। ছবি - বাসুদেব পাল

উত্তর-পূর্বেও আর্থিক কেলেঙ্কারী কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকারের কমনওয়েলথ গেমস, টু জি স্পেকট্রাম, আদর্শ আবাসন প্রকৃতি আর্থিক কেলেঙ্কারীর পাশাপাশি কংগ্রেস শাসিত বিভিন্ন রাজ্যের বিরুদ্ধেও উঠছে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ। উত্তর-পূর্ব ভারতের মতো বিচ্ছিন্নতাবাদ-প্রবণ ও আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত অঞ্চলেও ৫০,০০০ কোটি টাকার সরকারি দুর্নীতির অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছে। এর মধ্যে কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ-এর অসমে ২০০৯-১০ আর্থিক বর্ষে অন্তত ১৫,০০০ থেকে ২০,০০০ কোটি টাকার আর্থিক অনিয়ম হয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে। এর পাশাপাশি ওই আর্থিক বছরেই কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকারের বিরুদ্ধে অসমে চার লক্ষ কোটি টাকা তছরূপ করার মারাত্মক অভিযোগও উঠেছে।

গত ২৯ জানুয়ারি গুয়াহাটি-তে একটি সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপি-র সর্বভারতীয় সম্পাদক ডঃ কিরীট সোমাইয়া বলেন, "উত্তর-পূর্ব ভারতে আর্থিক দুর্নীতির পরিমাণ ৫০,০০০ কোটি টাকারও বেশি অতিক্রম করে যেতে পারে। এই অঞ্চলের মানুষের জন্য উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ অর্থের মাত্র ১০ থেকে ২০ শতাংশ খরচ করা হয়েছে। বিজেপি-র তরফ থেকে সাংসদ বিজয়া চক্রবর্তী, বিজেপি-র সাধারণ সম্পাদক তাপির গাও এবং আমাকে নিয়ে গঠিত একটি সত্য-উদ্‌ঘাটনকারী সমিতি উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ ও সেইসাথে তার প্রমাণও সংগ্রহ করেছেন।

(এরপর ৪ পাতায়)

কেন্দ্রীয় সরকারকে তোপ আদবানীর

নিজস্ব প্রতিনিধি।। প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন লালচকে জাতীয় পতাকা তুলতে না দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য সরকারকে তুলোধনা করে দেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি-র বরিষ্ঠ নেতা লালকৃষ্ণ আদবাণী বলেন, "১৯৫৩ সালে ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জন্য সর্বপ্রথম আন্দোলন শুরু করেন। সেই পতাকা তুলতে গিয়ে জনসঙ্ঘের ১৫ জন কর্মী প্রাণ হারিয়েছিলেন। এবার দেখা গেল লজ্জার মাথা খেয়ে বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের দুই সর্বোচ্চ রাজনৈতিক নেতৃত্ব লোকসভার বিরোধী দলনেত্রী সুষমা স্বরাজ এবং রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা অরুণ জেটলি-কে ৬২ তম প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন জম্মু-কাশ্মীর জেলের ভেতর কাটাতে হলো। তাদের অপরাধটা কি? তাঁরা স্রেফ দেখতে চেয়েছিলেন বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রভাবিত শ্রীনগরে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলিত হচ্ছে।" শুধু তাই নয়, পতাকা তুলতে গিয়ে বিজেপি কর্মীরা যেভাবে অত্যাচারিত হয়েছেন, তা গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জাজনক।

নিচের ছবিতে ফুটে উঠেছে শ্রীনগরে গত ২৬ জানুয়ারি পতাকা তুলতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য সরকারের যৌথ আক্রমণে কী নিদারুণ মারধোর ও অত্যাচারের শিকার হয়েছেন বিজেপি-র কার্যকর্তারা।

বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রে কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ উদ্যোগে হত্যা গণতন্ত্রকেই

নন্দীগ্রাম-নেতাই কাণ্ডের প্রেক্ষিতে চাই তৃতীয় শক্তির অভ্যুত্থান

নিশাকর সোম

পাঠক ক্ষমা করবেন— একটু ফিরে দেখছি। ১৯৫০-এর ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির ঘোষণা —"আগ লাগাও, আগ লাগাও এ-কুটি আজাদীকে।" কলকাতায় দেশপ্রিয় পার্কে জমায়েত হয়ে বোমাবাজি করে "দক্ষিণ কলকাতা মুক্ত" করার আওয়াজ দিলেন "কমঃ লাল", আসল নামটা লিখে আর তাঁকে এই বৃদ্ধ বয়সে লজ্জা দিচ্ছি না। তারপর ঠিক ওই দিনই ইন্টারন্যাশান্যাল কমিউনিস্ট ইনফরমেশন— কোমিন ফর্ম-এর মুখপত্র "ফর এ ল্যাস্টিং পীস ফর-এ পিপলস্ ডেমোক্রেসি"তে তথাকথিত ইনসারেকশন (অভ্যুত্থান) বন্ধ করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ভারতের কমিউনিস্টদের। তেলেঙ্গানা আন্দোলন প্রত্যাহার করা হলো। বৃটিশ কমিউনিস্ট নেতা কর্মী তথা ভারতের কমিউনিস্টদের পরিচালক রজনীপাম দত্ত-এর নির্দেশ— 'গণতান্ত্রিক পথে আন্দোলন কর'। ১৯৫১-তে ভারতের তিন কমিউনিস্ট নেতা অজয় ঘোষ, বাসবপুন্নাইয়া এবং দামোদরণ গেলেন মস্কোয়। স্তালিনের পৌরহিত্যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচী কর্মনীতি প্রোগ্রাম ও স্টেটমেন্ট পলিসি গৃহীত হলো। অবশ্য এর আগেই বি. টি. রণাদিভে অপসৃত হয়েছেন, সাধারণ সম্পাদক পদে বসেছিলেন রাজেশ্বর রাও। তেলেঙ্গানা আন্দোলন শুধু প্রত্যাহারই হলো না, জওহরলালের নির্দেশে কমিউনিস্টরা তেলেঙ্গানার বিপ্লবীদের অস্ত্র সমর্পণ করালো কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। ১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ-নির্বাচনে কমিউনিস্টরা অংশ গ্রহণ করেছিল। তেলেঙ্গানার নেতা রবিনারায়ণ রেড্ডি রেকর্ড ভোট পেয়ে লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন।

ভারতীয় কমিউনিস্টরা সংসদীয় ব্যবস্থার রস-রূপ গ্রহণ করতে শুরু করলো। ১৯৫১ সালের কর্মসূচীতে বলা হয়েছিল, শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রীর ভিত্তিতে সামন্তবাদ বিরোধী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী একচেটিয়া পুঁজি বিরোধী জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবই হবে লক্ষ্য। আবার ১৯৬৭ সালের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর সিপিএম-এর কেন্দ্রীয় কমিটি বিপ্লবী পরিস্থিতির হাঁক পাড়লো। আর সিপিআই-তো জনসঙ্ঘের সঙ্গে বিহারে মন্ত্রিসভায় অংশগ্রহণ করে বিহারের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী মহামায়া প্রসাদকে দিয়ে সিপিআই-এর পার্টি কংগ্রেস উদ্বোধন করালো। এর পরেই পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৭-১৯৬৯ প্রথম ও দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট-এর রাজত্বে এ-রাজ্যের সিপিএম ক্ষমতার মাখন-এর স্বাদ পেলো।

এ-অবস্থা মানতে না পেরে একদল সিপিএম কর্মী নকশালবাড়িতে আন্দোলন শুরু করে নকশালী মতবাদ প্রচার করে। তারা সিপিএম-এ ভাঙন ধরালেন। তখনও সিপিএম বিপ্লবী ফ্যাশনটা বজায় রাখছিল। এরপর দেশের জরুরী অবস্থার সময়ে সিপিএম-এ গুরুতর মতবিরোধ দেখা দিল। পার্টির তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক পি. সুন্দরাইয়া ইন্দিরা গান্ধীর ২০ দফা সমর্থন করে আর এস এস-কে বেআইনি করা সমর্থন করে শেষমেশ পার্টি পরিত্যাগ করলেন। এদিকে এ-রাজ্য সিপিএম পার্টি পতাকা ফেলে দিয়ে জয়প্রকাশ নারায়ণ-এর আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। এর পরে লোকসভা নির্বাচনে প্রফুল্ল সেনের হাত ধরে, ময়দানে অটলবিহারী বাজপেয়ী-আদবানিদের হাত ধরে ইঁদুরের গর্ত থেকে বেরিয়ে প্রকাশ্যে সিপিএম এলো। লোকসভা নির্বাচনে জনতা পার্টির সঙ্গে মৈত্রী করে রাজনীতির আসরে জাঁকিয়ে বসলো সিপিএম। কিন্তু এরপরেই বিধানসভা নির্বাচনে প্রফুল্ল সেন-কে লেঙ্গি মেরে বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সিপিএম তথা বামফ্রন্ট রাজ্য-সিংহাসনে বসলো। ধীরে ধীরে সিপিএম হয়ে উঠলো দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিদের পৃষ্ঠপোষক আর শ্রমিক-কৃষক-দরিদ্র মানুষের শোষক। পার্টির মধ্যে সুবেদার-মনসবদার-জমিদার-প্রমোটার। এখনতো দেখা যাচ্ছে— সিপিএম-এর প্রাক্তন সাংসদ-এর বাড়িও তল্লাশি হচ্ছে।

মামলা হয়েছে সিপিএম-এর ৮ জন নেতার নামে— তাদের নাকি (নিরুপম সেন সহ) সুইস ব্যাঙ্ক-এ টাকা আছে। সিপিএম-এর নেতারা আজ নিজেরা এতই দুর্নীতিগ্রস্ত, তারজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনও আন্দোলন করে না। সৃষ্টি করে নন্দীগ্রাম থেকে নেতাই।

মামলা হয়েছে সিপিএম-এর ৮ জন নেতার নামে— তাদের নাকি (নিরুপম সেন সহ) সুইস ব্যাঙ্ক-এ টাকা আছে। সিপিএম-এর নেতারা আজ নিজেরা এতই দুর্নীতিগ্রস্ত, তারজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনও আন্দোলন করে না। সৃষ্টি করে নন্দীগ্রাম থেকে নেতাই। সিপিএম-এর লজ্জা হওয়া উচিত, তাদের মুখ্যমন্ত্রীকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী "মিথ্যাবাদী" বলেছেন। সিপিএম নামধারী কমিউনিস্টদের সম্পর্কে পুরানো কথা তুললাম এই কারণে যে ক্ষমতার লোভে কমিউনিস্টরা কি পর্যায়ে যেতে পারেন। আর বামফ্রন্টের অন্য শরিকরা লাভের গুড় খেয়ে বিপ্রবী ঠেকুর তুলেছিল।

সিপিএম-এর সর্বশেষ অবস্থা হলো— পলিটব্যুরোর বিগত সভায় মোটামুটি এই বোধোদয় হয়েছে যে, এ-রাজ্যে সিপিএম-কে আর ক্ষমতায় ফেরানো যাবে না। সিপিএম-বামপন্থী বুর্জোয়া পার্টি হলেও প্রশাসনিক কাজে সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

নেতাজি সুভাষচন্দ্রের জন্মদিনে দিল্লীতে যখন প্রধানমন্ত্রী সুভাষচন্দ্র-কে শ্রদ্ধা জানাচ্ছিলেন তখন সেখানে উপস্থিত থাকেননি সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী এবং মমতা ব্যানার্জি। মমতা ব্যানার্জি-তো সুভাষচন্দ্রকে "মরণোত্তর" ভারতরত্ন দেওয়ার প্রস্তাব করে মেনে নিয়েছেন নেতাজির মৃত্যু। নেতাজি-কে তো গান্ধী-জওহরলাল কংগ্রেস থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

তৃণমূলের এক সাংসদ কবীর সুমন পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন। আর এক সাংসদ শতাব্দী রায়কে পার্টি একটি সিনেমাতে মমতার ভূমিকায় অভিনয় করার অপরাধে "নেত্রীর ভাবমূর্তি" কলঙ্কিত করার জন্য তীব্র সমালোচনা করেছে। সেই সিনেমা-কে সেনসর বোর্ড ছাড়পত্র দেয়নি। সেনসর বোর্ডে তৃণমূল সংখ্যাগরিষ্ঠ। অন্য এক তৃণমূল সাংসদ সুদীপ্ত হালদার-কে তৃণমূলের কর্মীরা প্রহার করেছে। বাইপাস নিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মারামারি চলছে।

এ-রাজ্যের কংগ্রেস তো ক্ষমতায় যাবার লোভে মমতার কথায় "ওঠবস" করে যাচ্ছেন।

সিপিএম পচে গেছে— তৃণমূলের পচন দেখা যাবে ক্ষমতায় আসার পর। চাই তৃতীয় শক্তির অভ্যুত্থান।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

প্রজাতন্ত্র দিবসে কংগ্রেস সরকারের নগ্ন ভূমিকা

প্রজাতন্ত্র দিবস ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী স্বদেশপ্রেমী জনগণের নিকট একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণই কেবল নহে, অত্যন্ত পবিত্র দিবসও বটে। কারণ এই দিবসটি আমাদের সংবিধান দিবসও বটে। এই দিনেই স্বদেশের সংবিধান প্রণীত হইয়াছিল, যে সংবিধানে আমাদের স্বদেশ একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র হিসাবে ঘোষিত হইয়াছিল। সার্বভৌম অর্থাৎ সর্ব অর্থে স্বাধীন। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট ভূমির অধিকারী হইল ভারতের জনগোষ্ঠী। এই সার্বভৌম ভূমির পূর্ণরূপে অধিকারী হইল এই স্বাধীন জনগোষ্ঠী। প্রজাতন্ত্রের অর্থই হইল এই স্বাধীন জনগোষ্ঠীই দেশের স্রষ্টা ও মালিক। জনসাধারণই হইবে এ দেশের শাসনব্যবস্থা। এই শাসনব্যবস্থার ভিত্তি গণতান্ত্রিক।

এই সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতীক হইল আমাদের ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা। এই পতাকার মর্যাদা এই দেশের প্রতি ইঞ্চি ভূখণ্ডে সমানভাবে প্রযোজ্য। ভারতীয় জনগোষ্ঠীর আবেগ জড়াইয়া আছে এই জাতীয় পতাকাকে ঘিরিয়া। ভারতীয় সার্বভৌম ভূখণ্ডে কোনও অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীদের দ্বারা যদি জাতীয় পতাকা লাঞ্ছিত হয় তবে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের জাতীয়তাবাদী জনগণের অবশ্যই অধিকার আছে সেই অঞ্চলে জাতীয় পতাকার মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

সেই পবিত্র কর্মটি উদযাপন করিতেই গিয়াছিল ভারতীয় যুবমোর্চার সভাপতি অনুরাগ ঠাকুরের নেতৃত্বে সারা ভারতবর্ষ হইতে আগত হাজার হাজার যুবক। কিন্তু যে কাজ ভারতবর্ষের সরকারের করা উচিৎ ছিল, সেই কাজটিই করিতে গিয়াছিল ওই যুবকগণ। বিদেশী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বর্তমানে এক বিদেশিনী পরিচালিত কংগ্রেস দলের কাছে জাতীয় পতাকার মর্যাদা আজ অকিঞ্চিৎকর হইয়া গিয়াছে। জাতীয় পতাকাবাহীদের উপর যে আক্রমণ এই কংগ্রেস সরকার নামাইয়া আনিয়াছিল তাহা এক কথায় অভূতপূর্ব। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে চালাইয়াছিল এই আক্রমণ। কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা যুবকদের দিয়া ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর উপর আক্রমণ দিনের পর দিন চালাইয়াছিল, তাহা রোধ করিতে এই কংগ্রেস সরকার কখনও কি এইরকম আকাশপথে এই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উপর আক্রমণ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে কয়েকটি রাজ্যে যে মাওবাদীদের এত বাড়-বাড়ন্ত তাহার বিরুদ্ধে কি কংগ্রেস সরকার কখনও সর্বাত্মক সৈন্য চালনা করিয়াছে?

কেন? তাহা রাজনীতির বিষয়, কিছু রাজনীতি অবশ্যই আছে, তাহা না হইলে কবি শঙ্খ ঘোষের মতো মাওবাদী সমর্থক কি করিয়া পদ্মশ্রী পাইলেন? খোলাখুলি সাংবাদিক সম্মেলন করিয়া তিনি এ রাজ্যের রাজ্যপালকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করিয়াছেন। কারণ রাজ্যপাল হিংসায় বিশ্বাসী মাওবাদীদের সমর্থন না করিবার জন্য বুদ্ধিজীবীদের অনুরোধ করিয়াছিলেন মাত্র। এ হেন রাষ্ট্রবিরোধী যুদ্ধে অবতীর্ণ মাওবাদীদের সমর্থককে কেমন করিয়া রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পদ্মশ্রী দেওয়া হইল, কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার জনগণের কাছে কি তাহার জবাবদিহি করিবেন? এই শঙ্খ ঘোষ সাংবাদিক সম্মেলনে বিনায়ক সেনের আজীবন কারাবাস সাজারও বিরোধিতা করিয়াছেন। এই বিনায়ক সেনের সাজা দিয়াছেন ছত্তিশগড়ের আদালত। এটা তো আজ জলের মতোই পরিষ্কার যে বিনায়ক সেনের সহিত মাওবাদীদের এবং বিদেশের সহিতও যোগাযোগ ছিল। তাহা হইলে এই মাওবাদী সমর্থকরাই বা কেন তাহার হইয়া গলা ফাটাইতেছেন? একদল বিদেশীই বা ছুটিয়া আসিয়াছেন কেন আমাদের সার্বভৌম আদালতে বিচারপতিদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে? যত আন্দোলন এই শহরে। ছত্তিশগড়ে কিন্তু কোনও আলোড়নই নাই। কারণ আর কিছুই নয়— আসলে এই শহরে ঘাঁটি গাড়িয়া আছেন একদল মুখোশধারী মাওপন্থী। তাহাদের সহযোগী আছেন বিদেশেও, মাওবাদীদের উচ্ছেদ করিতে সর্বাত্মক পদক্ষেপ কেন কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকার লইতে পারিতেছেনা তাহার কারণও এই দেশী-বিদেশী রাজনীতি। সারা ভারতবর্ষের দিকে তাকাইলেই এটা পরিষ্কার হইয়া যাইবে। এ প্রশ্ন নিন্দুকগণ করিতেই পারেন—কেন অকংগ্রেসী রাজ্যগুলোতেই মাওবাদীদের এত সক্রিয়তা?

দুর্নীতির পঙ্কিলে নিমজ্জিত কংগ্রেস সরকারের একজন উচ্চপদস্থ অফিসারও দুর্নীতিরোধ করিতে গিয়া ভেজাল মাফিয়াদের হাতে প্রাণ দিয়াছেন এবারের প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে। তাহার আগে আগেই ঘটিয়া গিয়াছে কমনওয়েলথ গেম্‌স্ দুর্নীতি, টেলিকম দুর্নীতির মতো আরও অনেক দুর্নীতি। হইবেই বা না কেন? যে সরকার দুর্নীতি রোধের সর্বোচ্চ সংস্থা সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশনের সর্বোচ্চ বসাইয়াছেন একজন প্রত্যক্ষ দুর্নীতিগ্রস্তকে সেই সরকারের সমস্ত কাজে ভূমিকাতো নগ্ন হইবেই। ইহা আর নতুন কথা কী!

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

শিশুদিগকে শিক্ষা দিতে হইলে তাহাদের প্রতি অগাধ বিশ্বাস সম্পন্ন হইতে হইবে। বিশ্বাস করিতে হইবে যে প্রত্যেক শিশুই ঈশ্বরীয় শক্তির আধার স্বরূপ, আমাদিগকে তাহার মধ্যে অবস্থিত সেই নিদ্রিত ব্রহ্মকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার সময় আরও একটি বিষয় আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে তাহারাও যাহাতে নিজেরা চিন্তা করিতে শিখে, এই বিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহ দিতে হইবে। এই মৌলিক চিন্তার অভাবই ভারতের বর্তমান হীনাবস্থার কারণ।

—স্বামী বিবেকানন্দ

পাকিস্তানে অ্যান্টি-ব্ল্যাসফেমি আইন ঃ ধর্মীয় অসহিষ্ণু(তার উৎস

এন. সি. দে

সম্প্রতি পাকিস্তানে অমুসলিমদের নিগৃহীত হওয়ার কয়েকটি ঘটনা এবং ইসলাম অবমাননার বদনাম দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অ্যান্টি ব্ল্যাসফেমি আইন প্রয়োগ করে মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এই মধ্যযুগীয় ঘটনায় পাকিস্তানের সাধারণ মানুষজনতো বটেই, এমনকী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীগণের মধ্য থেকেও কোনও প্রতিবাদ ওঠেনি। উল্টে গোঁড়া মৌলবাদী সংগঠনগুলোর মদতে একদল সুযোগ সন্ধানী মানুষ এই আইনের দৌলতে ব্যক্তিগত বিদ্বেষকে মিটিয়ে নিতে রাস্তায় নেমে পড়েছে। উন্নত প্রযুক্তির দৌলতে বিশ্ব যখন মানুষের আঙিনায় এসে উপস্থিত হয়েছে, পাকিস্তানের মানুষ তখন আঙিনার অর্গল বন্ধ করে মধ্যযুগে থেকে যেতে বদ্ধপরিকর। এই মধ্যযুগে থেকে যাওয়ার জন্যই কি তারা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাকিস্তানের সৃষ্টি করেছিলেন? পাকিস্তানে কী কোনও উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবী নেই? থাকলেও, তাদের কী উদার-সহিষ্ণু সমাজ গড়ার কোনও দায় নেই? বুদ্ধিজীবীদের যেহেতু কোনও সামাজিক দায় নেই, পাক সরকারও তাই নিষ্ক্রিয়, নিরুত্তাপ নিশ্চিন্ত।

ইসলাম যদি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী হোত তাহলে ভারত ভাগ হলো কেন? ইসলাম রাষ্ট্র হয়েও পশ্চিম পাকিস্তান কেন তারই অন্তর্গত পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করল? হিন্দুস্থানের অন্তর্গত হয়েও কেন হিন্দুরা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীর থেকে বিতাড়িত হলো? এইরকম হাজারো প্রশ্ন করা যেতে পারে ইসলামী অসহিষ্ণুতার।

এক অতি সাধারণ নারী আশিয়াবিবি। নাম শুনেই বোঝা যায় তিনি ছিলেন জন্মসূত্রে মুসলমান। কিন্তু বিবাহসূত্রে হয়েছিলেন খৃশ্চান। সম্ভবতঃ এটাই ছিল তার অপরাধ। সামান্য জল নিয়ে বাক-বিতন্ডায় রটিয়ে দেওয়া হলো তিনি নাকি ইসলামের অবমাননা করেছেন। আর সেই অপরাধে পাক আদালত এই অ্যান্টি ব্ল্যাসফেমি (ধর্মদ্রোহিতা বিরোধী) আইনেই তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে গত নভেম্বরে।

মহম্মদ শফি (৪৫) ও তার ছেলে মহম্মদ আসলাম (২০) গত বছর এপ্রিলে গ্রেপ্তার হন, তাদের অপরাধ তারা তাদের মুদীর দোকানের বাইরে একটি পোস্টার ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। ওই পোস্টারটিতে নাকি একটি ইসলামিক কার্যক্রমের প্রচার করা হয়েছিল এবং তাতে কোরাণের কিছু উক্তি ছিল। পাক আদালত গত ১০ জানুয়ারি তাদের এই আইনেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন। উভয়েই যে জন্মসূত্রে মুসলমান ছিলেন তা তাদের নামের মধ্যেই পরিস্কার। তারা অন্য ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন কিনা তা জানা যায়নি। তবে একজন তো ইমাম ছিলেন বলে খবর। তাহলে কী তারাডি দার ইসলামের পক্ষপাতি ছিলেন? জানা যায়নি সেকথা।

গত জানুয়ারির ১১ তারিখের আগে লাহোরের ঘটনা। এক খৃস্টান রমণী বিবাহ করে আসেন এক মুসলমান পরিবারে। পরিবারে ছিলেন এক ননদ। বৌদি ও ননদে ঝগড়া ভারতীয় উপমহাদেশে এক নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। ভাই ঘরে ছিল না। এই সুযোগে বাড়ীর বাইরে এসে বৌদির বিরুদ্ধে চিৎকার করে বলতে থাকে যে বৌদি নাকি ইসলাম ও মহম্মদের বিরুদ্ধে অবমাননাকর কথা বলেছে। বৌদি জন্মসূত্রে খৃস্টান হওয়ায় প্রতিবেশীরা সহজেই সেকথা বিশ্বাস করে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি গোঁড়া মৌলবাদী ধর্মীয় সংগঠনের এক নেতা মহম্মদ সামিরের নেতৃত্বে একদল লোক ওই খৃস্টান মহিলার ঘরে ঢুকে তাকে বেদম মারতে শুরু করে। আর একদল লোক ওই মহিলার মা ও বোনকেও মারতে শুরু করে। পরে ওই মহিলাকে জুতোর মালা পরিয়ে গাধার পিঠে চড়িয়ে এলাকায় ঘোরানো হয়। তিনি পথে প্রত্যেক মানুষের পায়ে ধরেন বাঁচানোর জন্য। বারবার বলেছেন তিনি ইসলামকে অবমাননা করেননি। তা সত্ত্বেও কেউ তাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেনি। অতঃপর ওই খৃস্টান মহিলার পরিবার এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে। কেউ তাদের থাকতে দিচ্ছে না ওই গোঁড়া মৌলবাদী দলের ভয়ে। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা দরকার যে এই মহম্মদ সমির ওই একই দলের সদস্য যে দলের সদস্য মুমতাজ কাদরী যিনি পাক পাঞ্জাবের রাজ্যপাল সলমল তাসিরকে হত্যা করেছিলেন।

এ বছরের জানুয়ারির শুরুতেই নিহত হলেন পাঞ্জাবের গভর্ণর সলমন তাসির তারই নিরাপত্তা রক্ষীর হাতে। অপরাধ তিনি মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত খৃস্টান ধর্মান্তরিত আশিয়া বিবিকে আশ্বস্ত করে কথা দিয়েছিলেন অ্যান্টি ব্ল্যাসফেমি আইন সংশোধন করার চেষ্টা করবেন। নিরাপত্তা রক্ষী মুমতাজ কাদরী তার এই কাজের জন্য অনুতপ্ত তো নয়ই বরং ইসলামে অবিশ্বাসী খৃস্টান মহিলার প্রতি দরদ দেখানোর দায়ে দোষীকে হত্যা করে তিনি গর্বিত। ইসলামের নামে এই হত্যালীলাকে সমর্থন করতে এগিয়ে এসেছে অনেক গোঁড়া জেহাদি গোষ্ঠী। এমনকী গভর্ণরের শোক প্রার্থনায় অংশগ্রহণের বিরুদ্ধেও ফতোয়া জারি করেছে তারা। যে তার শোক প্রার্থনায় অংশ নেবে তার বিরুদ্ধেও হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে। গোঁড়া মুসলিম গোষ্ঠীগুলি পাকিস্তানে এতটাই শক্তিশালী যে লাহোরের কোনও মৌলবাদীদেরই সলমন তাসিরের শেষকৃত্যে হাজির করানো যায়নি। তারা এতটাই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে রয়েছে যে লাহোরের ঐতিহাসিক বাদশাহী মসজিদের প্রধান মৌলবী প্রথমে আসতে রাজি হয়েও শেষ পর্যন্ত আসতে সাহস পায়নি। হাইকোর্টের একজন উকিল ফারুক সুলেরিয়া পর্যন্ত বলেছেন, আমরা সমস্ত উকিলরা কাদরীর এই কাজের সমর্থন। আমরা সকলে মিলে কাদরীকে আইনী সাহায্য দেব।

পাকিস্তানে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে যখন রয়েছে এই ধরনের গোঁড়ামি, তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মীয় উদারতা, সহিষ্ণুতা ও সহমর্মিতা আসবে কেমন করে। পাকিস্তানের শাসকবর্গ চিরদিনই এই ধর্মীয় গোঁড়ামিকে উস্‌কে দিয়েই তাদের ক্ষমতা ভোগ করে গেছে। তাদের সেই অপরিণামদর্শিতার ফসল হচ্ছে এই অ্যান্টি ব্ল্যাসফেমি আইন। এই ধর্মীয় অসহিষ্ণুতাকে সমাজ থেকে উপড়ে ফেলতে প্রথমে এগিয়ে আসতে হবে শিক্ষিত সম্প্রদায়কেই। এই মুহূর্তে সেই ধরনের সাহসী আত্মত্যাগী বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা নগণ্য। এই নগণ্যদের মধ্যেই কয়েকজন হলেন নিহত সলমন তাসির, শেরী রেহমান ও বিলাওয়াল ভুট্টো। সলমন তাসির ছিলেন একজন প্রগতিশীল মুসলমান গভর্ণর। তিনি চেয়েছিলেন ইসলামকে বিশ্বের মানুষের কাছে এক উদার ধর্মমত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে। তিনি পাকিস্তানে গোঁড়ামির উৎস অ্যান্টি ব্ল্যাসফেমি আইনকে সংশোধন করতে চেয়েছিলেন। অন্যজন শেরী রেহমান একজন প্রাক্তন পাক মন্ত্রী। তিনি একজন মহিলা সিভিল সোসাইটি সক্রিয়া সদস্য। তিনিও এই আইনের সংশোধন চেয়েছিলেন। এই একই কারণে করাচির বৃহত্তম মসজিদ, সুলতান মসজিদের ইমাম তাকে 'কাফের' (ইসলামে অবিশ্বাসী) এবং 'ওয়াজিব-উল-কাতিল' (বধযোগ্য) বলে ঘোষণা করেন। সিভিল সোসাইটির অন্য দুই কর্মী সলমন তাসিরের পুত্র শান তাসির। একজন সাংবাদিক আলি চিস্তি এবং শেরী রেহমান এই ইমামের বিরুদ্ধে করাচির দরক্ষান (Darkhsan) থানায় নালিশ জানিয়েছেন। এও জানিয়েছে যে এই ইমাম গভর্ণরের হত্যাকারী মুমতাজ কাদরীকে এই হত্যার জন্য প্রশংসা করেছেন। আরেকজন হলেন প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী বেনাজির ভুট্টোর ছেলে বিলাওয়াল ভুট্টো। তিনি মৌলবাদী জেহাদিদের বিরুদ্ধে, সরাসরি জেহাদ ঘোষণা করেছেন। তার মতে, যারা গভর্ণরের হত্যাকারীদের সমর্থন করছেন তারাই প্রকৃত ইসলামবিরোধী (blasphemers)।

ইসলামে বিশ্বাসীরা যখন বাড়তে বাড়তে বিশ্ব মানবতার চক্ষুশূল হয়ে পড়ে তখন একদল ইসলামী বুদ্ধিজীবী ইসলামের শান্তির বাণী নিয়ে আসল-নকল ইসলামের প্রচারে নেমে পড়ে। এমনই একজন ইসলামী বুদ্ধিজীবী হলেন মৌলানা ওয়াহিদুদ্দিন খান। তিনি সেন্টার ফর পিস অ্যান্ড স্পিরিচুয়ালিটি ইন্টারন্যাশনাল-এর প্রতিষ্ঠাতা। ইনি সলমন তাসিরের হত্যাকাণ্ডের দিন-চারেক পরেই একটি ইংরেজী দৈনিকে লিখেছেন যে ইসলামে ধর্মদ্রোহিতা (blasphemy) হচ্ছে সামান্য একটি স্বাধীনতার অপব্যবহার, কোনও বিরাট অপরাধ নয় যার জন্য তাকে আইনী শাস্তি দেওয়া যাবে। তিনি আরও লিখেছেন যে নবীর বিরুদ্ধে বলা কিংবা তার প্রশংসা করা বক্তার নিজস্ব পছন্দের ব্যাপার। পছন্দ যাইহোক, বিচারের ভার ঈশ্বরের। তার কথায় ইসলামের ভিত্তি হলো শান্তিপূর্ণ কথোপকথন।

মিঃ খানের উপরোক্ত উক্তিগুলো বিশ্বের শান্তির পক্ষে আদর্শ। কিন্তু বিশ্বের বাস্তব

(এরপর ৪ পাতায়)

চীনা নাগরিক

(১ পাতার পর)

বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, বেজিং-এর পূর্ব ডংচেঙ জেলার বাসিন্দা (বাড়ির নং-৩৬, বেজিং গ্লোবাল ট্রেড সেন্টার, টাওয়ার-সি, এফ-১৯১০-১৯১২, নর্থ থার্ড রিং রোড, পূর্ব ডংচেং জেলা, বেজিং) ওয়াংকে 'নন অফিসিয়াল কভার এজেন্ট' সন্দেহে-ই নির্বাসিত করা হয়েছে। গোয়েন্দা দপ্তরের এক বরিষ্ঠ আধিকারিকের কথায়— "পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে নাগা-বিদ্রোহীদের সঙ্গে কুইং ওয়াংয়ের সুস্পষ্ট যোগাযোগ রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়াস্থিত বিভিন্ন দেশের সরকারী অবস্থানের বিরোধী (অর্থাৎ বিদ্রোহমূলক) কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করে আমাদের ধারণা চীনের গোয়েন্দাবাহিনী-র সঙ্গে কুইং যুক্ত রয়েছেন।" কুইংয়ের কাছ থেকে উদ্ধার করা ম্যাকবুক ল্যাপটপ থেকে গোয়েন্দারা কাচীন ইনসারজ্যান্ট ক্যাম্প-এ কুইং, মুইভার সঙ্গে কুইং, নেপালের মাওবাদী শীর্ষনেতা প্রচণ্ড ওরফে পুষ্পকুমার দহলের সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন ছবি পাওয়া গেছে। সুতরাং এইসব বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে কুইং ওয়াংয়ের যোগাযোগের প্রমাণ জলের মতোই স্পষ্ট।

এত তথ্য পাবার পরেও এদেশের গোয়েন্দাদের কাছে কুইং ওয়াং নামক চীনা মহিলাটি রহস্যময়ী-ই থেকে গেছেন। ইতিপূর্বে গত বছরের আগস্টে তিনি ভারতে এসেছিলেন ভিন্ন পাসপোর্টে (নং-জি ১৬৫৫৫৭২১)। সেই সময়েই নাগাল্যান্ডে সম্ভবত থুঙলাং মুইভার সঙ্গে দিল্লীতে প্রথম সাক্ষাৎ হয় তাঁর এবং সুদীর্ঘ একটি বৈঠকও হয় তাঁদের মধ্যে। তিনি ওই সময়েই নাগাল্যান্ডের কোহিমা, মঙ্গলামুখের হেব্রন-এ নাগা-জঙ্গিদের কয়েকটি ক্যাম্প ঘুরে দেখেন। হেব্রনে ক্যাম্পে থাকার সময় ডিমাপুর পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে ও দিল্লীতে প্রেরণ করে। ইয়ুনান প্রদেশের কানমিং থেকে গত আগস্টে কলকাতাতেও এসেছিলেন ওই মহিলাটি। এও জানা যাচ্ছে চীনের কানমিংয়ে এন এস সি এন-আই-এমের একটি ঘাঁটিও রয়েছে। সেখানের মুখ্য অস্ত্র-সরবরাহকারী ছিলেন অ্যান্থনি শ্রীমরে। বর্তমানে তিনি জেলে রয়েছেন। ১৯৯৪ থেকে ছ'বার চীনে গিয়েছেন তিনি। তাঁর সঙ্গেও কুইং ওয়াংয়ের যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন গোয়েন্দারা। যাই হোক, ওয়াংকে 'রহস্যময়ী' ছাড়া আর অন্য কোনও তকমা দিতেই নারাজ গোয়েন্দারা। কারণ দক্ষিণ এশিয়ার অনেকগুলি বিদ্রোহী সংগঠনেই পড়েছে তাঁর অদৃশ্য ছায়া। তাঁর পেছনে চীনের প্রত্যক্ষ মদতের কথাও বলেছেন গোয়েন্দারা। তাঁর কার্যকলাপ এতই রহস্যজনক যে বারবার ধরা পড়েও স্রেফ প্রমাণাভাবে ছাড়া পেয়ে যাচ্ছেন কুইং ওয়াং। আপাতত এই রহস্যময়ী তাই ভারতের কাছে অশনি-সংকেত হিসেবেই প্রতিভাত হচ্ছেন।

কেলেঙ্কারী কংগ্রেসের

(১ পাতার পর)

আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি আমরা আমাদের রিপোর্ট বিজেপি সভাপতি নীতিন গডকরির হাতে তুলে দেব।" সোমাইয়া আরও জানান, "বিজেপি-র এই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টীম বা সত্য উদ্‌ঘাটনকারী দল উত্তর-পূর্বের অরুণাচল প্রদেশ, অসম এবং মণিপুরের বিভিন্ন জায়গায় ইতিমধ্যেই গিয়েছে। এখনও অবধি ২১টি খুব গুরুতর দুর্নীতি আমরা চিহ্নিত করতে পেরেছি। অসমে সরকারের অকর্মণ্যতা, ভ্রান্ত প্রয়োগ এবং প্রতারণা বর্তমানে রুটিন কাজের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। ভারতের কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (সিএজি বা ক্যাগ) -এর ২০১০-এর রিপোর্টে এধরনের উল্লেখ রয়েছে।" প্রসঙ্গত, ক্যাগ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে ১০,০০০ কোটি টাকার বেশি অর্থ অপচয় করেছে অসম সরকার। বিজেপি মনে করছে, এই অপচয় হওয়া অর্থের পরিমাণ অন্তত ১৫০০০ থেকে ২০,০০০ কোটি টাকা হবে। তাদের অভিযোগ, এই দুর্নীতিতে যারা যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে তরুণ গগৈ সরকার কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি। প্রয়োজনে এনিয়ে আদালতে যাবারও হুমকি দিয়েছে বিজেপি।

ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার উৎস

(৩ পাতার পর)

পরিস্থিতির পক্ষে উক্তিগুলোর গ্রহণযোগ্যতা নেই। কথাগুলো যদি সত্য হোত তাহলে কোনও রাষ্ট্রে, রাজ্যে বা অঞ্চলে মুসলিম জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে গেলে সেখানকার প্রশাসন ইসলামী হয়ে যায় কেন? একটি রাষ্ট্রে তো সমস্ত ধর্মীয় জনগোষ্ঠী বসবাস করে, তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে একটি রাষ্ট্র কেন ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত হয়? পাকিস্তান যদি ইসলাম রাষ্ট্র না হোত তাহলে তো ইসলামে অবিশ্বাসীদের শায়েস্তা করার জন্য এই ব্ল্যাসফেমি আইন তৈরী করার দরকারই হোত না। ওয়াহিদুদ্দিনজী এই আইন রদ বা সংশোধনের প্রয়োজনীয়তার কথা এড়িয়ে গেছেন। ইসলাম যদি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী হোত তাহলে ভারত ভাগ হলো কেন? ইসলাম রাষ্ট্র হয়েও পশ্চিম পাকিস্তান কেন তারই অন্তর্গত পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করল? হিন্দুস্থানের অন্তর্গত হয়েও কেন হিন্দুরা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীর থেকে বিতাড়িত হলো? এইরকম হাজারো প্রশ্ন করা যেতে পারে ইসলামী অসহিষ্ণুতার। হিন্দু ধর্মকে রক্ষার জন্য এই ধরনের অসহিষ্ণু আইন তৈরি করার প্রয়োজন পড়েনি কারণ হিন্দু ধর্ম একটি সনাতন ধর্ম। ইসলামে অসহিষ্ণুতার উল্লেখ করে তাই গান্ধীজী বলেছিলেন, ''যে তরবারির সাহায্যে ইসলামের সৃষ্টি ও প্রসার সেই তরবারি এখনও ইসলামের মূল শক্তি। ইসলাম যদি হয় শান্তি তবে এই তরবারিকে ত্যাগ করতে হবে।'' —(ইয়ং ইন্ডিয়া), স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন, ''তাদের মূলমন্ত্র ঃ আল্লাহ্ এক এবং মহম্মদ তাঁর একমাত্র রসুল। যা'কিছু এর বাইরে তা' কেবল খারাপই নয়, তা সমস্তই তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করে দিতে হবে।''

হিন্দুধর্মে এই অসহিষ্ণুতা ও অনুদারতা না থাকায় বৈদিক সংস্কৃতিকে সমালোচনা করেও বুদ্ধদেব একজন মহাপুরুষ বলে স্বীকৃত। স্বামীজী বুদ্ধদেবের মতামতের সমালোচনা করেছেন কিন্তু শ্রদ্ধার সঙ্গে। শঙ্করাচার্য আজীবন বুদ্ধদেবের বেদবিরোধী, মতামতের বৈদিক ধর্মকে রক্ষা করেছেন স্বমহিমায়। কিন্তু তিনিই আবার বুদ্ধদেবকে ভগবান বুদ্ধদেব বলে সম্বোধন করে বলেছেন, 'বুদ্ধদেবের উপদেশ ও জীবনকে ঠিক ঠিক না বোঝার ফলেই বৌদ্ধগণ বেদবিরোধী মত প্রচার করছেন।'

ইসলামী বুদ্ধিজীবীরা যদি মনে করেন যে ইসলাম উদার ধর্মমত। তাহলে আজকের ইসলামী দুনিয়ায় ধর্মের নামে যে গোঁড়ামি, পরমত অসহিষ্ণুতা চলেছে তা সংস্কারে এগিয়ে আসছেন না কেন? মনে রাখবেন ইসলামে উদারতা আজকের বিশ্বে শান্তির একান্ত প্রয়োজন। কবে আসবে সেইদিন।

এই সময়

রেহাই নেই

প্রাক্তন টেলিকম মন্ত্রী এ-রাজা ফের বিপাকে। ২০০১ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত ৮ বছরে টু জি লাইসেন্স বিলিবন্টন নিয়ে যে এক-সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছিল গত ৩১ জানুয়ারি তার রিপোর্ট জমা পড়েছে সরকারের কাছে। বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, ১৫০ পাতার সেই রিপোর্টে প্রাক্তন টেলিকম মন্ত্রী এ রাজা ছাড়াও তাঁর সহযোগী আর কে চান্ডোলিয়া, সিদ্ধার্থ বেহুরিয়ার নামও রয়েছে। নিন্দুকেরা বলছেন, রাজাবাবু যতদিন টাকা খেয়েছেন ও তাঁর মনিবদের খাইয়েছেন, ততদিন তিনি ছিলেন সরকারের সুয়োরাণী। এখন ক্ষমতা যেতেই হয়েছেন দুয়োরাণী।

মাও-মোকাবিলা

নিজের রাজ্য বিহারে নকশাল অধ্যুষিত এলাকায় মাওবাদীদের মোকাবিলায় সম্প্রতি কেন্দ্রের কাছে আরও বেশি নিরাপত্তারক্ষী দাবী করলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার। তবে নীতিশের এই দাবী নতুন নয়। এর আগেও কেন্দ্রের কাছে এহেন দাবী জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু সম্ভবত রাজনৈতিক স্বার্থপরতার কারণেই এই দাবী মানতে চায়নি কেন্দ্র। বর্তমানে তেইশ কোম্পানী সি আর পি এফ আছে বিহারে। মাও-অধ্যুষিত এলাকার খতিয়ানে তা নিতান্তই সামান্য। তবে বর্তমানে সারা দেশজুড়েই যে রাজনৈতিক ডামাডোল চলছে তাতে নীতিশের এই আবেদন 'হা-হতোস্মি' কিনা তা সময়ই বলবে। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য, রাজ্য যদি শুধু মাও-মোকাবিলাতেই সময় ও অর্থ দেয় তবে উন্নয়ন ব্রাত্যই থেকে যায়। আর হয়তো এক প্রজন্মের অনুন্নয়ন-ই জন্ম দেয় আগামী প্রজন্মের মাওবাদী-র।

অপরাধী

দেশভাগের অপরাধী কে? বইমেলার ইউ বি আই অডিটোরিয়ামে প্রকাশিত হয়েছে সুনন্দ সান্যালের নতুন বই 'দি সিকল অ্যান্ড দি ক্রিসেন্ট ঃ কমিউনিস্ট মুসলিম লিগ অ্যান্ড ইন্ডিয়ানস পার্টিশন।' সুপরিচিত অধ্যাপক সুনন্দবাবু বরাবরই আপাদমস্তক সিপিএম বিরোধী অর্থাৎ 'ওরা'-র দলে। বিশেষ করে পবিত্র সরকার কাণ্ড থেকে শুরু করে একাধিক ক্ষেত্রে সিপিএমের বহু মুখোশ খুলেছেন তিনি। এই বইটিও সেই তালিকায় নবতম সংযোজন। তবে বই-প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত আরেক 'ওরা' দলভুক্ত মানুষ প্রাক্তন ভূমি-রাজস্ব সচিব দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় দেশভাগে অপরাধী সিপিএমের সাম্প্রতিক অপরাধটি উল্লেখ করেন— ৩৪ বছরের বামরাজত্বে কলকাতা পুলিশের প্রধান কার্যালয় লালবাজারের ১ থেকে ২ কিলোমিটারের মধ্যে হিন্দুরা নিহত বা আহত হচ্ছেন।

সিপিএম-মাও আঁতাত

এরাজ্যে মাওবাদী উত্থানের পেছনে ৩৪ বছরের বাম-শাসনের অরাজকতাকেই দায়ী করলেন বিজেপি-র কেন্দ্রীয় নেতা শাহনাওয়াজ হুসেন। বিজেপি-র নবজাগরণ যাত্রা উপলক্ষে গত ১ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় আসা শাহনাওয়াজ এও জানান, মাওবাদীদের সঙ্গে তৃণমূলের আঁতাতের যে অভিযোগ সিপিএম করছে তা ভিত্তিহীন। বরঞ্চ নিজেদের অপদার্থতা ঢাকতেই অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে সিপিএম। সিপিএমের সর্বোচ্চ দুই নেতা প্রকাশ কারাট ও সীতারাম ইয়েচুরির সঙ্গে নেপালের মাওবাদীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি।

কালো টাকা

বেশ কিছুদিন আগে নিজের ব্লকে কালো টাকা উদ্ধারে কেন্দ্র সরকারের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করেছিলেন ভারতের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবাণী। সম্প্রতি ফের সুইস ব্যাঙ্ক সহ বিদেশের বিভিন্ন ব্যাঙ্কে গচ্ছিত কালো টাকা উদ্ধারের প্রশ্নে ফের সরব হলেন তিনি। কিন্তু ইউ পি এ সরকার এনিয়ে এখনও সম্পূর্ণ নীরব। রহস্য ভাঙলেন জনৈক রসিক— 'কে আর ব্যাঙ্ক খুঁড়িয়া নিজের কালো টাকা উদ্ধার করিতে চায়!'

অতিথি কলম

মুজফফ্‌র হোসেন

আমেরিকা-কানাডায় হিন্দুত্বের রমরমা এদেশে সন্ত্রাসবাদী তক্‌মা

যে সময় সারা ভারতেই কংগ্রেস দল ও সরকারের প্রমুখ ব্যক্তিরা 'হিন্দু সন্ত্রাস' (ভগবা সন্ত্রাসবাদ) বলে গলা ফাটাচ্ছেন তখন তাদেরকে অনুরোধ জানাই— অনুগ্রহ করে একটু ভারতের বাইরে তাকিয়ে দেখুন। বিশেষত, আমেরিকা ও কানাডায় হিন্দু ও হিন্দুত্বের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা কিভাবে বেড়ে চলেছে। পরে এই বদনামকারীদেরকেও হয়তো বা পশ্চাত্তাপ করতে বাধ্য হতে পারে।

হিন্দুত্বের প্রতি বহির্ভারতের মানুষের শ্রদ্ধা ও গ্রহণযোগ্যতা দেখার জন্য সারা পৃথিবী ঘুরতে হবে না। শুধুমাত্র কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে গিয়ে ওখানে 'হিন্দু' হওয়ার জন্য মানুষের গর্ববোধ একবার দেখে আসুন। তাঁদের অন্তরে 'হিন্দু' পরিচয়ের জন্য কতটা শ্রদ্ধা, টান ও আবেগ রয়েছে তা দেখলে চমকে উঠবেন। গত বৎসর দীপাবলীর সময়ে প্রকাশিত ডগলাস টার্ডের প্রবন্ধটাই এক্ষেত্রে দেখে নেওয়া যথেষ্ট হবে। প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল— 'ঝলমলে ভ্যাঙ্কুভার'। ওই একই সময়ে আমেরিকার প্রসিদ্ধ 'টাইম' ম্যাগাজিনের একটি প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল— ''আমরা সবাই কি 'হিন্দু' হয়ে গেছি?'' এরকমই প্রবন্ধ ফলাও করে বের হচ্ছে আমেরিকা ও কানাডার মতো তথাকথিত উন্নত ও প্রগতিশীল দেশে।

এর একটা কারণ অবশ্যই আছে। ওই সব দেশে ব্যাপক সংখ্যায় মূল ভারতীয়দের বসবাস। দ্বিতীয়ত, ওখানকার ভারতীয় ছাড়া অন্যদের ওপরও হিন্দু-পূজাপাঠ, আধ্যাত্মিকতার বহুল প্রভাব। ২০০১-এর জনগণনা অনুসারে কানাডায় হিন্দুদের সংখ্যা চার লাখ পঁচাত্তর হাজারের মতো, আর আমেরিকায় এই সংখ্যাটাই এগারো লক্ষের কাছাকাছি। যে সকল হিন্দুরা ওখানে বসবাস করছেন— তাঁরা হিন্দু রীতিনীতি, পূজা-পাঠ, আদর্শবাদ, উৎসব পালা-পার্বণ ওখানেও নিয়মিত পালন করে থাকেন। ওই সব দেশের সর্বসাধারণ নাগরিকরাও 'হিন্দু' না হওয়া সত্ত্বেও উৎসবাদিতে নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করে আনন্দের ভাগীদার হন। তাঁরা উৎসবে যোগ দেন একারণেই যে, তাঁরা কোনও কট্টরতা বা মৌলবাদ ওখানে খুঁজে পান না। বরং আনন্দে বিভোর হয়ে যান। এজন্যই রাধাকৃষ্ণ মন্দির হোক অথবা গণপতি (গণেশ) উৎসবই হোক—স্থানীয়রা (বেশিরভাগই খৃস্টান) আগ্রহ সহকারে যোগ দেন। হিন্দু চিন্তন-দর্শনের অজ্ঞেয়বাদী রহস্যময়তা ওঁদেরকে দারুণ আকৃষ্ট করে।

হরিনামে বিভোর বিদেশী ভক্তরা।

এজন্যই জুলিয়া রবার্টস্ অভিনীত ছায়াছবি 'ইট প্রে অ্যান্ড লাভ' জনপ্রিয় হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ওই সিনেমার অভিনয়ের পরই জুলিয়া রবার্টস হিন্দু ধর্মগ্রহণ করে হিন্দু হয়ে যান (২০১০ সালে)। এখানে একটা কথা, আমেরিকার তুলনায় কানাডায় মানুষ আরও বেশি করে হিন্দুত্বকে গ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছে।

ভারতীয় নারীর পোশাকে হরিদ্বারে জুলিয়া রবার্টস্।

পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে যে সকল সমীক্ষা করা হয়েছে, সেই হিসেবে দেখা যাচ্ছে, ধর্ম-সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু ধর্মের চিন্তন-দর্শনের প্রতি তারা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। কানাডার পশ্চিম উপকূলের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ব্যাপক সংখ্যায় হাজার হাজার যোগ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ধ্যানযোগ কেন্দ্র, নিরামিষ হোটেল এবং আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এই সকল কেন্দ্রের বেশিরভাগের সঞ্চালকই হিন্দু। এক সমীক্ষা অনুসারে তিরিশ শতাংশ কানাডাবাসী হিন্দু দর্শন অনুসারে 'পূর্বজন্মে' বিশ্বাস করেন। মহিলাদের মধ্যে এর পরিমাণ আরও বেশি—৩৭ শতাংশ। এর ফলেই কানাডার অ-হিন্দু জনসাধারণ পুনর্জন্মেও বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন। একবার মারা যাওয়ার পর আবার পুনর্জন্ম হবে।

ভারতের 'যোগ দর্শন' এসময়ে সারা পৃথিবীকে স্বীয় প্রভাবে প্রভাবিত করে ফেলেছে। মধ্য-প্রাচ্যের সাধারণ মানুষই নন, ওখানকার শেখ ও রাজা-মহারাজাদেরও যদি সকালে যোগাসন-প্রাণায়াম করতে দেখেন তাহলেও আশ্চর্য হবেন না, ভারতে আমাদের যোগাচার্যদের সমালোচনা হলেও এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আচার্য রবিশঙ্কর, মহর্ষি মহেশ যোগী, স্বামী চিন্ময়ানন্দ এবং বাবা রামদেবজীর মতো ব্যক্তিরা এবিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সাঁই-ভক্তদের এবং ইসকনের 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' নাম জপে আকৃষ্ট হয়ে লক্ষ লক্ষ লোকেরা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছেন। এতেও আশ্চর্য হবেন না যদি দেখা যায় বহির্ভারতে কেউ সকালে মীরা, সুরদাসের ভজন অথবা রসখাঁনের ভক্তিভাবের কবিতা গুণগুণ করছে। প্রতি তিনজনের মধ্যে দুজন আমেরিকাবাসী যোগ, ধ্যান, প্রাণায়াম এবং সমাধির মাধ্যমে আত্মা ও শরীরের আলাদা হওয়ার সম্ভব বলে বিশ্বাস করেন। আমেরিকায় ঋক্-বেদের চর্চা-পড়াশোনা ভালোমতো বেড়েছে। এসকল খবর ও ঘটনা-পরম্পরা জানার পর হিন্দুত্ব-বিরোধীদের ভেবে দেখতে হবে— 'হিন্দু-হিন্দুত্ব' সন্ত্রাসবাদী হতে পারে? এর উত্তর যদি নঞর্থক হয় তাহলে ভারতে 'হিন্দু সন্ত্রাস'-এর ব্যাখ্যাকারদের এবার থেকে 'ক্ষান্তি' দেওয়া উচিৎ।

সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছুদিন যাবৎ ক্ষমতা কেন্দ্রের (কেন্দ্র সরকার) অলিগলি থেকে একটা প্রচার চালানো হচ্ছে— দেশে 'গৈরিক সন্ত্রাসবাদ' জোরকদমে বেড়ে চলেছে। সন্ত্রাসেরও যে রঙ রকম-রকম হয় তা পৃথিবী প্রথম শুনল। গৈরিক বা ভগবা রঙ্ দেশে-বিদেশে মন্দিরের শীর্ষে উড্ডীন পতাকায় দেখা যায়, আর ভারতের সংসার ত্যাগী সাধু-সন্তদের পোষাকের রঙ্ও গৈরিক। সারা বিশ্বেই যেখানে যেখানে 'সাম্যবাদী বিপ্লব'-এর ঘটনা ঘটেছে সেখানেই অসংখ্য-অগণিত মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। কেউ তাকে সন্ত্রাসবাদ বা আতঙ্কবাদ আখ্যায় ভূষিত করেননি। ভারতের ঊর্দু গণমাধ্যম তালিবানদের নিন্দাবাদ জানালেও কখনই তাকে 'সবুজ আতঙ্কবাদ' নাম দেয়নি। মাথায় সাদা ফেট্টি বেঁধে যদি কেউ কোনও আন্দোলনে নেমে থাকেন— তাদেরকেও সাদা বা শ্বেত আতঙ্কবাদ আখ্যা দেওয়া হয়নি। কিন্তু কেউ যদি হিন্দু হিসেবে আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন তাহলেই তাদেরকে 'গৈরিক সন্ত্রাস' নামে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এই নামকরণের প্রথম সূচনা হয়েছে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন 'ইউ পি এ' সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দ্বারাই। এরপরই পেটোয়া কংগ্রেস ব্রিগেড তোতাপাখীর মতো 'গৈরিক সন্ত্রাস' (ভগবা আতঙ্কবাদ) শব্দটি নিয়মিতভাবে আওড়ে চলেছে। সর্বত্রই প্রচার চালানো হচ্ছে। এই কংগ্রেসীদের জানা উচিৎ স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়েও স্বাধীন ভারতের জন্য নির্দিষ্ট পতাকার রঙ ছিল 'গৈরিক', প্রস্তাবিত জাতীয় পতাকা। সর্বসম্মতভাবে ওই রঙ্ স্থির হয়েছিল আলোচনার মাধ্যমে। সকলে একবাক্যে সায় দিয়ে বলেছিলেন— আমাদের পতাকার রঙ হবে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতার পরিচয় চিহ্ন। ১৯২৯ থেকে '৩২-এর সময়ে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ মন্দির ও ধর্মস্থানে এই একই গৈরিক বর্ণের পতাকা সগৌরবে উড্ডীন। বস্তুতপক্ষে, ভারতের চিরন্তন শাশ্বত গৈরিক রং-নিয়ে রাজনীতি করা হচ্ছে বলেই একসব।

যদি গৈরিক রঙ্‌কে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয় তাহলে তো সারা

(এরপর ৭ পাতায়)

অ রকম

দাতা ও গ্রহীতা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এই মুহূর্তে দাতার সম্পত্তির আর্থিক মূল্য...। না, সম্পত্তি বলাটা বোধ হয় ঠিক হবে না। তার চেয়ে বরং বলা ভাল তিনি যে কোম্পানীটির সর্বেসর্বা গত আর্থিক বছরে সেই ভি গার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের বার্ষিক ব্যবসায়িক লেনদেনের পরিমাণ ছিল ৪৫৪.০৯ কোটি টাকা। বোঝাই যায় দাতা মানুষটি কত বড়লোক। আর গ্রহীতা হলেন নিতান্তই এক ট্রাক ড্রাইভার। স্বাভাবিক, যাঁর অত কোটি টাকার ব্যবসা, তিনি গরীব ট্রাক ড্রাইভারকে দান করবেন না তো কে করবেন? কিন্তু দাতা চিত্তিলাপিল্লি গ্রহীতা 'জয় জন'কে যা দান করেছেন, আর্থিক মূল্যে সত্যিই তার কোনও বিচার-ই চলে না। ভাবতে আরও অবাক লাগে কেন না আজ যখন কিডনি পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত একের পর এক রাঘব-বোয়ালের হদিশ মিলছে, 'কিডনি দান'-কে কেন্দ্র করে নোংরা ব্যবসা গড়ে উঠেছে, তখন একজন কোটিপতি কোন মন্ত্রবলে অনাত্মীয় ছাপোষা এক গরীবের জন্য নিজের শরীরের দুটি অমূল্য অঙ্গের একটিকে স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিতে আসেন!

এই সুযোগে কিডনি সম্পর্কে দু'চার কথা বলে নেওয়া যাক। কিডনি-র অবস্থান মানুষের পৃষ্ঠদেশে। কিডনি আমাদের দেহে রেচন অঙ্গের কাজ করে অর্থাৎ মানবদেহে যেসমস্ত ক্ষতিকারক রেচনপদার্থ রক্তের সঙ্গে মিশে থাকে তা দূরীভূত করে রক্তকে পরিশুদ্ধ করে। এককথায় কিডনি মানুষের দেহে 'ফিল্টার' (ছাঁকনি)-এর ভূমিকা নেয়। কিডনি-র সংখ্যা দুই। একটি কিডনিতেও কাজ চলে যায়। তবে এক্ষেত্রে দৌড়ঝাঁপ, খেলা-ধুলো ইত্যাদি করা যায় না। দু'টি কিডনি-ই অকেজো হলে 'ডায়ালিসিস' বলে একটি দুর্বিসহ ডাক্তারী পদ্ধতি রয়েছে যার দ্বারা রক্তকে পরিশুদ্ধ করা যায় ঠিকই। তবে 'ডায়ালিসিস'-ও অনন্তকাল ধরে চলতে পারে না। এরও একটি নির্দিষ্ট সময়-সীমা রয়েছে। সেই সময়-সীমা পার হলে মানুষ আর বাঁচেন না। জয় জনের দু'টি কিডনি-ই অকেজো হয়ে গিয়েছিল। বাঁচবার আশা ছিল না। কিন্তু তাঁকে বাঁচার আলো দেখিয়েছেন কোচৌশেফ চিত্তালিপিল্লাই। নিজের অমূল্য কিডনি দান করে। এতো চুল, নখ নয় যে কাটলে আবার গজাবে!

ঘটনা হলো, গত দেড় বছর ধরে তিরুবনন্তপুরমে স্থাপিত কিডনি ফেডারেশন অব্ ইন্ডিয়া তাদের কিডনি ব্যাঙ্কের জন্য একজনও দাতা পাচ্ছিলেন না। প্রথম ফ্লাড গেট খুললেন চিত্তালিপিল্লাই। ফেডারেশন সূত্রে জানা যাচ্ছে, অন্তত হাজারখানেক কিডনি-হীন রোগী অনাত্মীয় কিডনি-দাতার কিডনি নিজ শরীরে প্রতিস্থাপনের জন্য আবেদন করেছেন। কিন্তু হাজার তো দূরের কথা একজনও এগিয়ে আসেননি কিডনি দিতে। প্রথম এলেন চিত্তালিপিল্লাই। তাঁর দেখাদেখি এবার অনেকে এগিয়ে আসবেন বলে আশা রাখছেন কিডনি ফেডারেশন অব্ ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ। আর কিডনি গ্রহীতা জয় জনের কথাও উল্লেখ করতে হয় আলাদাভাবে। জনের স্ত্রী জোলি তাঁর একটি কিডনি দান করেছেন। জনের মা, ত্রিশূরের বাসিন্দা নিতান্ত গরীব টি এস বিজুকে তাঁর কিডনি দান করবেন বলে ঘোষণা করেছেন, প্রেরণা বোধহয় চিত্তালিপিল্লাই-ই।

আর চিত্তালিপিল্লাই জানাচ্ছেন, ২০০৯-এ ডেভিড চিরামেল-এর কিডনি দান-ই নিজের কিডনি অপর মানুষের প্রাণ বাঁচাতে উৎসর্গ করতে প্রেরণা যুগিয়েছে। সবকিছু দেখে বলতে হয়— এক প্রাণ (কিডনি দান), অনেক জীবন।

গ্রহীতা চিত্তালিপিল্লাই

দাতা জয় জন

সিলেটে হিন্দুদের সম্পত্তি জবরদখল

সংবাদদাতা॥ সিলেটে হিন্দুদের সম্পত্তি বেদখল করা হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের সিলেট জেলার বালাগঞ্জ উপজেলার সংখ্যালঘু হিন্দুদের সম্পত্তি কাগজপত্র জাল করে হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক বিএনপি নেতার নামে। প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার হিন্দু সম্পত্তি কাগজপত্র জাল করে জীবিতকে মৃত ও নিঃসন্তান দেখিয়ে নাম পর্যন্ত পরিবর্তন করে দখল করে নেওয়া হয়েছে। এমনকী শাসক দলের বিরুদ্ধে ও অভিযোগ, তাদেরও প্রচ্ছন্ন মদতে পুলিশ আদালতে ভুল ও মিথ্যে প্রতিবেদন জমা দিয়েছে।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে— বালাগঞ্জ উপজেলার প্রেমতলা গ্রামের অক্ষয়কুমার গুপ্তের তিন ছেলে অনিল চন্দ্র গুপ্ত, অম্বিকা গুপ্ত ও সুনীল গুপ্ত উত্তরাধিকার সূত্রে তাদের পৈত্রিক সম্পত্তির মালিক। তবুও জমি জায়গা অবৈধভাবে দখল করেছে বিএনপি দলের ওসমানীনগর থানা শাখার কোষাধ্যক্ষ মুনাফের আলি এবং তার ভাই আজমের আলি। উক্ত উপজেলার কালামারা মৌজার ১০৪১ খতিয়ানের ১১০১ দাগের দশ একর জমির মধ্যে ৬ একর ৬৬ শতক জমি আলি ভাইদের দখলে চলে গিয়েছে। সেখানে তারা বহুতল ফ্ল্যাট ও বাজার তৈরি করে চুটিয়ে ব্যবসা ও বসবাস করছে।

ওই এলাকায় প্রতিশতক জমির দামই আট থেকে দশলাখ টাকা। ২০০৩ থেকেই ওই মৌজায় গুপ্ত পরিবারের জমি ক্রমশ জবরদখল হয়েছে। তখন ক্ষমতায় ছিল প্রচণ্ড সংখ্যালঘু তথা হিন্দুবিরোধী বিএনপি — জামাত এ ইসলামি জোট। ক্ষমতায় থাকার সুবাদেই বিএনপি'র ছোট-বড় নেতারা সংখ্যালঘু হিন্দুদের ভাতে মারার জন্যে জমি-জায়গা সরকারি মদতে দখল করতে থাকে। ২০০৮ সালে জীবিত অনিল গুপ্তকে মৃত এবং অম্বিকা গুপ্তকে নিঃসন্তান দেখিয়ে বিএনপি নেতা ও তার ভাই গুপ্তদের জমি

বিএনপিরসিলেটজেলাসভাপতি।

বেদখল করে নেয়। এজন্য জালিয়াতি করে যে কাগজপত্র তৈরি করা হয় সেখানে— সিলেট সিটি কর্পোরেশনের জীবনমৃত্যুর খতিয়ানের খাতায় উল্লিখিত তথ্যমতে (নিবন্ধন বই নং-১৪, তাং-২৭-১০-০৯, নিবন্ধন নং- ০০৪৩৩৮) ২০০৯ সালের ২৫ অক্টোবর সিলেট শহরে মেয়ের বাড়িতে অনিল গুপ্ত মৃত্যুবরণ করেন। ওই দিনই চালিবন্দর শশ্মানঘাটে তাকে দাহ করা হয়েছে বলে পঞ্জীকৃত করা আছে।

জানা গেছে যে, সরকারি অফিসের তথ্য অনুযায়ী হিন্দু দায়ভাগ (উত্তরাধিকার) আইনে অনিল গুপ্তের একমাত্র মেয়ে শিপ্রা দাস এবং মৃত অম্বিকা গুপ্তের একমাত্র মেয়ে প্রীতিরাণী ধর তাদের পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। গত বছর ১৯ আগস্ট দখলীকৃত জমির মালিকানা দাবী করে এবং অবৈধ 'নাদাবীপত্র' বাতিলের আবেদন জানিয়ে সিলেটের মুখ্য বিচারকের আদালতে মামলা দায়ের করেছেন শিপ্রা দাস। আদালত বিষয়টি তদন্তের জন্য ওসমানীনগর থানায় পাঠিয়ে দেন। থানার এস আই দখলকারীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মিথ্যা প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। সেই প্রতিবেদনে বলা হয়— বাদিনীর পিতা অনিল গুপ্ত ১৯৮০ সালে ভারতে চলে গেছেন এবং তারপর তাকে আর এলাকায় দেখা যায়নি। শিপ্রা তার পরিচয়পত্র (আই ডি নং-১৯৩৪১১৯৩১৩২০০০০০১) উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, "তাঁর জীবিত পিতাকে মৃত ও নিঃসন্তান দেখিয়ে অবৈধ দলিল করা হয়েছে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ অনেকের কাছে বিচার চেয়ে কোনও সুবিচার পাননি। রহস্যজনক কারণে পুলিশ আদালতে মিথ্যা প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। দখলকারীরা আমাদের নানাভাবে ভয়ভীতি ও হুমকি দিচ্ছে। আমি আমার পৈত্রিক সম্পত্তি ফিরে পেতে চাই।"

ওসমানীনগর থানার বিএনপি নেতা মুনাফর আলি দখলের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তার কথা, আমি জমি কিনেছি তবে কিছু সমস্যা আছে।

এদিকে গোয়ালাবাজার ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান সৈয়দ কওসর আহমেদ বলেছেন, "অনিল গুপ্ত ও অম্বিকা গুপ্ত ওই এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। কেউ যদি তাকে নিঃসন্তান ও দেশত্যাগী বলে দলিল করে থাকে তাহলে সেটা মিথ্যা। তাদের অনেক মূল্যবান সম্পত্তি ওই এলাকায় রয়েছে।"

ক্যাগ রিপোর্টে বেকায়দায় অসম সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বিরোধী দলের বিধায়ক সাংসদরা যতই চীৎকার-চেঁচামেচি হৈ-চৈ করুন না কেন যতক্ষণ না ক্যাগ (কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল) আঙুল দিয়ে নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আর্থিক দুর্নীতির কথা একবারও মুখ ফুটে

হিমন্ত বিশ্বশর্মা

তরুণ গগৈ

স্বীকার করেন না। এ বিষয়ে সোনিয়া কংগ্রেসের শাসনাধীন রাজ্য বা কেন্দ্রের মধ্যে কোনও ফারাক নেই।

তরুণ গগৈ নেতৃত্বাধীন অসম রাজ্য সরকার যে হিসাব দাখিল করেছে সেখানে হিসাব বহির্ভূত খাতে ২৩৬১.৬৭ কোটি টাকার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এখবর প্রকাশ হওয়ামাত্র অসমের বিরোধী দলের সঙ্গে একই সুরে তরুণ গগৈ এবং প্রভাবশালী মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার পদত্যাগ দাবী করেছে অসমের প্রভাবশালী অরাজনৈতিক সংগঠন কৃষক মজদুর সংগ্রাম সমিতি। ২০০২ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে অসম রাজ্য সরকার অতিরিক্ত টাকা তুলেছে। পরবর্তীক্ষেত্রে আইনসভার দ্বারা ওই টাকা কোনও খাতে ব্যয়বরাদ্দ অনুমোদন করবে— এটাই প্রচলিত প্রথা বা রীতি। এটা আবার সংবিধানের ২০৫ নং ধারা অনুসারে আবশ্যিক। ২০০২-০৩ অর্থ বছরে ওই অতিরিক্ত অর্থ তোলা হলেও ২০০৯-১০ পর্যন্ত নিয়ম মেনে তা বরাদ্দ করা হয়নি। এর ফলে অসম-এর বাজেট ম্যানুয়্যালও লঙঘন করা হয়েছে। ক্যাগ (কম্পট্রোলার অ্যাণ্ড অডিটর জেনারেল)-এর বক্তব্যে একথা পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে। ক্যাগ-এর ওই মন্তব্যের শীর্ষক অধ্যায় হলো— "ইন্টারন্যাল কন্ট্রোলস্ অ্যান্ড রিস্ক্ ম্যানেজমেন্ট ফর দি ইয়ার এণ্ডেড মার্চ ৩১, ২০১০"।

মোদ্দা কথা হলো আট বছর পার হলেও সরকার অতিরিক্ত অর্থ খরচের কোনও বিল-ভাউচারই দিতে পারেনি। সি এ জি রিপোর্টে—এই ঘটনাকে 'চূড়ান্ত অনিয়ম' বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অর্থ তোলার ক্ষেত্রেও এই 'অনিয়ম্'— একটি নতুন নজির। বিরোধীদের বক্তব্য, সি এ জি রিপোর্ট অনুসারে এটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম। আয়-ব্যয়ের আবশ্যিক আইনও লঙঘন করা হয়েছে। সি এ জি রিপোর্টের ওই অংশে (Internal Controls and Risk Management) বলা হয়েছে— সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের অডিটে আর্থিক ক্ষেত্রে দুর্বল ব্যবস্থাপনাই নজরে পড়েছে। আইন-নিয়ম-নীতি সবক্ষেত্রেই অসংলগ্নতা ধরা পড়েছে। এসবই প্রশাসনিক দপ্তরের অফিসারদের অবহেলা এবং অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা-পদ্ধতির প্রয়োগের চূড়ান্ত অভাব।

উদাহরণ হিসেবে ক্যাগ— অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি পাশ কাটিয়ে যাওয়া, সরকারি তহবিল ক্ষতি, খরচের ভুয়ো ভাউচার এবং যেসব অযৌক্তিক ব্যয় এড়ানো যেত তার উল্লেখ করেছে। ইতিমধ্যে ক্যাগ রিপোর্ট বিষয়ে তদন্তের দাবী জানিয়েছেন কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির সাধারণ সম্পাদক অখিল গগৈ। এই সঙ্গে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ এবং গগৈ মন্ত্রীসভার প্রভাবশালী মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার অবিলম্বে পদত্যাগের দাবী জানিয়েছেন।

চীনের ধৃষ্টতা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অ(োচলবাসীদের ভিসা দেওয়ার জন্য চীনের কড়া সমালোচনা করলেন ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও প্রাক্তন সাংসদ তাপির গাও। তিনি ভারত সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছে যে, ভারতভ্রমণকারী চীনাদেরকেও কেন্দ্র সরকার যেন একইরকম ভিসা (stapled visa) প্রদান করে।

প্রসঙ্গত, তাপির নিজে অ(োচলের অধিবাসী। তিনি ইটানগরে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে এক বৈঠকে কথাবার্তা প্রসঙ্গে উপরোক্ত(মন্তব্য করেন। তিনি জানান, চীন সম্প্রতি দুজন অ(োচলবাসীকে এধরনের ভিসা দিয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, চীন অনেকদিন ধরেই অ(োচলকে তাদের ভূখণ্ড বলে দাবী করে আসছে। এছাড়া প্রায়শঃই চীনা সেনারা ভারতে প্রবেশ করছে অবৈধভাবে।

চীনা প্রধানমন্ত্রী ওয়েন জিয়া বাও এর সাম্প্রতিক সফরের সময় গত মাসেই তাঁর সঙ্গে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কথাবার্তা হয়েছিল। চীন বরাবরই অ(োচল প্রদেশকে ভারতের অঙ্গরাজ্য বলে মেনে নিতে অস্বীকার করে। দ্বিপাি(ক আলোচনার মাধ্যমে সব বকেয়া বিষয় সমাধান করার প(দুই প্রধানমন্ত্রী একমত হয়েছিলেন। সম্প্রতি ভারতের ভারোত্তোলক যুকার সিবি এবং ভারতীয় ভারোত্তোলক ফেডারেশনের যুগ্ম সম্পাদক আব্রাহাম কে. তেচি চীনের ভারোত্তোলক ফেডারেশনের আমন্ত্রণে গত ১৫-১৭ জানুয়ারি চীনের ফুজিয়ান-এ গিয়েছিলেন। তাদেরকে চীন ওই স্টেপলড্ 'ভিসা'ই দিয়েছিল। এরকম ভিসা বিষয়ে গত মাসে ওয়েন জিয়াবাও-এর সফরের সময়ই ভারতের প(থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়েছিল।

ওয়েন জিয়াবাও বলেছিলেন, 'ভারত ও চীনের উচ্চস্তরীয় অফিসাররা বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করছেন। শীঘ্রই জম্মু-কাশ্মীরবাসীদের যে স্টেপলড্ ভিসা দেওয়া হচ্ছে তার অবসান হবে। চীন ভারতের প্রতিবাদকে গুত্ব দিয়ে ভাবনা-চিন্তা করছে।

নতুন দিল্লীর বিমানবন্দরেই অভিবাসন দপ্তরের অফিসাররা আপত্তি করেছিল চীনা দূতাবাসের ওই কারিকুরি নিয়ে। তখন শ্রীতেচি বলেন, চীনা দূতাবাস তাদেরকে জানিয়েছে যে, তাদেরকে সঠিক ভিসাই দেওয়া হয়েছে। আমাদেরকে অযথা অপমান ও হয়রানি করা হচ্ছে।"

এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে কংগ্রেসী সাংসদ টাকম্ সঞ্জয় জানান, চীন বিষয়টিকে গুত্ব দিয়ে দেখছে। অথচ বাস্তব অবস্থা হলো, চীন গত দু'বছর যাবৎ জম্মু-কাশ্মীরের অধিবাসীদেরকেও একই ধরনের স্টেপলড্ ভিসা দিয়ে চলেছে। ভারতের অভিযোগে শুধুমাত্র কাল(প করছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসে আর এস এস প্রধান মোহন ভাগবতও চীন-পাকিস্তানকেই ভারতের প(বিপদ বলে মন্তব্য করেছেন।

ভারতীয়দের স্টেপলড্ ভিসা

ঢাকেশ্বরী মন্দিরে চুরি, পাহারা থাকা সত্ত্বেও। নিরাভরণ মা ঢাকেশ্বরী (দুর্গা)।

উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব প্রদানে সর্বদলীয় প্রতিশ্রুতি

অসিত বরণ ঠাকুর

বাঙালি উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্বের দাবীতে ২০১০ সনের ২৮ ডিসেম্বরে 'সারা ভারত মতুয়া মহাসংঘ'-এর নেতৃত্বে কলকাতার মেট্রো চ্যানেলে সব রাজনৈতিক দলের উপস্থিতিতে সারা বাংলা ও বাইরের প্রায় লক্ষাধিক (যানজটের কারণে অনেকে ফিরে গেছেন) সর্বহারা উদ্বাস্তুদের গণপ্রতিবাদ বিক্ষোভের সুশৃঙ্খল মহাসমাবেশ হয়ে গেল তা এক ঐতিহাসিক, গুরুত্বপূর্ণ ও রাজনৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ সুদূর প্রসারী ঘটনা। এই প্রথম কলকাতার মানুষ মতুয়াদের বাদ্যযন্ত্রসহ উদ্বাস্তু হয়ে 'হরিবোল' এর নৃত্য দেখল। মতুয়া-বড়মার (বীণাপাণিদেবী ঠাকুরাণী) ডাকে বহু দূর-দূরান্ত থেকে তারা এসেছেন ট্রেনে, বাসে-ম্যাটাডোরে বা পায়ে হেঁটে ধর্মীয় কায়দায় ঠিক সময়ে এবং বিক্ষোভ সমাবেশের শেষে ফিরেও গেছেন নিয়ম মেনে।

ওই সমাবেশ ঐতিহাসিক এই কারণে যে অতীতের উদ্বাস্তু দাবীর সমস্ত গণসমাবেশকে আয়তনে ও গুণগত মানে ম্লান করে দিয়েছে। দল-মতের উর্দ্ধে উঠে মতুয়া ধর্মের লাল-সাদা নিশান (১৮৩০ সালে গৃহীত) হাতে, 'হরিবোল' এর সঙ্গে প্রথাগত বাদ্যযন্ত্রের বাজনা যেমন ছিল তেমনি ছিল চাকুরিজীবী, উকিল, ডাক্তার, লেখক ও বুদ্ধি জীবীসহ অনেক উদ্বাস্তু ও অন্যান্য গণসংগঠনের মানুষদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি। গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে ওই বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে মতুয়া-বড়মা ও সংঘাধিপতির (কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর) উদ্বাস্তু দাবী আদায়ে বড় আন্দোলনের প্রস্তুতির ডাক ও প্রয়োজনে আগামী দিনে 'রাইটার্স বিল্ডিং' বা দিল্লীর 'পার্লামেন্ট' ঘেরাও এর দৃঢ় ঘোষণা। রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ কারণ প্রায় সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা বিশেষ করে একদিকে যেমন রাজ্যের শাসক 'সিপিএম-ফরোয়ার্ড ব্লক' ও তাদের প্রবল বিরোধী তৃণমূল কংগ্রেস আর একদিকে তেমনি কেন্দ্রের শাসক কংগ্রেস ও তার বিরোধী বিজেপি-র এক মঞ্চে 'বড়মার' সঙ্গে এক সারিতে আসন গ্রহণ ও সব দলেরই উদ্বাস্তু নাগরিকত্বের দাবীর প্রতি দ্বিধাহীন সমর্থন।

সিপিএম রাজ্য সম্পাদক ও বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক অশোক ঘোষের মতুয়া বড়মাকে লেখা না আসার কারণ সম্বলিত শুভেচ্ছা-পত্র পড়ে শোনানো হয়। বিমান বসুর প্রতিনিধি হিসাবে আবাসনমন্ত্রী গৌতম দেব ও অশোক ঘোষের প্রতিনিধি হিসাবে ফরোয়ার্ড ব্লক বিধায়ক হরিপদ বিশ্বাস উদ্বাস্তু-নাগরিকত্ব দাবীকে রাজ্যের দাবী হিসাবে আখ্যা দিয়ে বাংলার ৪২ জন লোকসভা সাংসদ সহ সর্বদলীয় প্রতিনিধি নিয়ে দাবী আদায়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দরবার করার প্রস্তাব দেন এবং ২০০৩ সালের নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন বদলের দাবী জানান।

বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তথাগত রায় বলেন যে বাংলাদেশী উদ্বাস্তু তাড়ানোর চেষ্টা হলে বিজেপি সর্বতোভাবে বাধা দেবে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পরে আসা বাংলাদেশী উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার ১৯৭১ সালের কেন্দ্রীয় নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার দাবীও তিনি জানান। মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু গণহত্যার মর্মান্তিক ইতিহাস জানতে 'মরিচঝাঁপির তথ্যচিত্র সিডি' সংগ্রহ করার পরামর্শও দেন তিনি। সংবাদপত্রে প্রকাশ তৃণমূল কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় জাহাজমন্ত্রী মুকুল রায় প্রশ্ন তুলেছেন প্রথম ইউপিএ-র শরিক হিসাবে বামফ্রন্টের ৬১ জন সাংসদ বাঙালি উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা কেন করেননি? এ প্রশ্ন যথার্থ ও ন্যায়সঙ্গত। বামরাজত্বে অসহায় বাঙালি উদ্বাস্তুদের রাজনৈতিক সঙ্কীর্ণ স্বার্থে অপব্যবহার করে নির্যাতন, শোষণ, বঞ্চ না ও প্রতারণা এতদিন ধরে চলছে তা সর্বজনবিদিত।

প্রশ্ন হচ্ছে যে সর্বহারা বাঙালি উদ্বাস্তুদের শুধু নাগরিকত্বের দাবী পূরণ হলেই কি 'জাতীয় জ্বলন্ত উদ্বাস্তু সমস্যা' মিটবে? তবে এটা ঠিক নাগরিকত্বের দাবী অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। পায়ের তলায় মাটি ছাড়া কিছুই করা যাবে না। বাঙালি উদ্বাস্তুদের সমস্যা বহুবিধ। রুক্ষ দণ্ডকারণ্যে নির্বাসিত কৃষি নির্ভর উদ্বাস্তুদের তো সঠিক ও সার্বিক পুনর্বাসন হয়নি। ১৯৭৮-৭৯ সালে বামনেতাদের হাতছানির প্রতারণার শিকার হয়ে বহু দণ্ডক ফেরৎ উদ্বাস্তুদের মরিচঝাঁপিতে নিজ চেষ্টায় পুনর্বাসনের স্বপ্ন ব্যর্থ হয় সরকারি অত্যাচারে ও উৎখাতে। উদ্বাস্তু গণহত্যা বা অত্যাচারে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ বা দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা হবে না? দণ্ডকে বা ভারতের অন্যত্র বসবাসকারী বাঙালি উদ্বাস্তু যাযাবরদের সমস্যার সুরাহা হবে না? পশ্চিম পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের তো বৈষম্যমূলকভাবে সবকিছু দিয়ে সার্বিক পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। এনডিএ-র আমলে ২০০৪ সালের নাগরিকত্ব আইন পাস করা হয়েছে বাঙালি উদ্বাস্তুদের বঞ্চ না করে কেবলমাত্র তাদের নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য। অথচ ১৯৭১-এর পরে আসা বাঙালি উদ্বাস্তুদের ১৯৭২ বা ১৯৭৪ সালের ইন্দিরা-মুজিব চুক্তির মিথ্যা অজুহাতে নাগরিকত্ব দেওয়া নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো যা আজও বহাল। এই বৈষম্য কেন এবং কাদের খুশি করতে? রাজনৈতিক দল, উদ্বাস্তু সংগঠন, মানবাধিকার কর্মী বা সুশীল সমাজের বিদ্বজ্জনেরা বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে কিছু করবেন না? এই অমানবিক কৃত্রিম বিভাজনের মানসিকতাই বাঙালির পশ্চাদগতির কারণ। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনকারী বিদ্বজ্জন ও অন্যান্যদের অনুরোধ এই সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসুন। বাংলার বাইরে বাঙালি উদ্বাস্তুদের সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার স্বীকৃত বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ থেকে বঞ্চি ত হয়ে বাঙালিত্ব হারাচ্ছে। তপশিলি অন্তর্ভুক্ত উদ্বাস্তুরা তপশিলি জাতির স্বীকৃতি না পাওয়ায় সাংবিধানিক সুযোগ থেকে বঞ্চি ত হচ্ছে। জীবন-জীবিকা বা চাকুরীতে তাদের কোনও সুযোগ হচ্ছে না। অনুপ্রবেশকারী তকমায় সবাইকে হয়রানি তো নিত্য সমস্যা। পশ্চিমবঙ্গেও ধর-পাকড় চলছে বিদেশী হিসাবে এবং বর্ডারের ট্রানজিট ক্যাম্পে পুশব্যাকের জন্য রাখা হচ্ছে। এর সঙ্গে বাংলাদেশে যাতে সংখ্যালঘুরা অত্যাচারিত না হয় তাও দেখা দরকার ভারত সরকারের ও বাংলাদেশ সরকারের।

যে সমস্ত রাজনৈতিক দল উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিলেন তারা কতটা সেই প্রতিশ্রুতি রাখেন সেটা দেখার। বিধানসভা নির্বাচন পর্ব শুরু হয়ে গেছে। অতীতের অভিজ্ঞতায় বলে ভোট-প্রতিশ্রুতি নিতান্তই চমক। ভোট ফুরোলেই ভুলে যাবে। দেশভাগের বলি উদ্বাস্তুদের ঐতিহাসিক ও জন্মগত অধিকার পুনরুদ্ধারে সংগ্রাম করতে হবে একসাথে। এ সংগ্রাম অস্তিত্বের এবং মানবাধিকার, ন্যায়বিচার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার। এই মরণ-বাঁচনের সংগ্রামে আমাদের জিততেই হবে।

বাম-ডান নেতারা মতুয়া ভজনায় একত্রে এক মঞ্চে ।

আমেরিকা-কানাডায় হিন্দুত্বের রমরমা

(৫ পাতার পর)

ভারতবর্ষকেই সন্ত্রাসবাদী বলা হবে, কেন না 'গৈরিক' তো ভারতের রাষ্ট্রীয় সাংস্কৃতিক পরিচয় চিহ্ন। সেক্ষেত্রে 'সত্যমেব জয়তে' (মাণ্ডুক্য উপনিষদ) সহ তিনটি সিংহমুখের চেয়ার ও প্রতীকগুলোকেও সরাতে হবে সংসদসহ সকল স্থান থেকেই। যা প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় প্রতীক। যারা রাজনীতির কুটিল চশমা চোখে 'গৈরিক বা ভগবা সন্ত্রাস'-কে দেখতে পান তাদেরকে তো সবার আগে ওই প্রতীকগুলোকে হঠিয়ে দিতে হবে। জাতীয় পতাকার গেরুয়া রঙ্ও কি তাহলে সন্ত্রাসের দ্যোতক হয়ে গেল? ভারতের চারটি কুম্ভমেলা, সাগরমেলাও কি এবার 'সন্ত্রাসবাদীদের মেলা' বলে কথিত হবে? এসব মেলা কিন্তু সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক হিসেবেই সারা বিশ্বে মান্যতা লাভ করেছে এবং স্বীকৃত ও নির্বিবাদ সত্য। গৈরিকের ছটায় বিভূষিত এরকম লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় তীর্থস্থান ভারত জুড়ে রয়েছে— সর্বসাধারণ মানুষ ওখানে যাবার জন্য সদা-সর্বদা লালায়িত। উত্তরের শ্রীরামমন্দির থেকে দক্ষিণের আয়াপ্পা মন্দির (সবরীমালাই) পর্যন্ত শ্রদ্ধালুদের বিরামহীন আনাগোনা। আর অসমের কামাক্ষ্যা থেকে পশ্চিমের সোমনাথ মন্দির নিরন্তর আকর্ষণস্থল। এছাড়াও মাঝপথে রয়েছে শিরডি ও পণ্ঢারপুর। সাঙ্কেতিক অর্থে বলাই যায়— আশি শতাংশ ভারতীয় গৈরিককেই হৃদয়ে বরণ করেছে যা আদৌ অতিশয়োক্তি নয়।

তখন স্বাভাবিক প্রশ্ন উঠে আসে— তাহলে কি শতকরা আশিভাগ ভারতীয়ই সন্ত্রাসবাদী? ওরাই নির্বাচনে ভোট দিতে যান। এঁদের ভোটেই বর্তমানে বিভিন্ন দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছে। এক্ষেত্রে যদি বলা যায় যে, সোনিয়ার (ইউ পি এ-র চেয়ারপার্সন) সরকারও ভগবা আতঙ্কবাদীদের ভোটেই নির্বাচিত হয়েছে? যারা তাঁকে বা তার দলকে দিল্লীর মসনদে আসীন করল তাদেরকেই শাসকরা সন্ত্রাসবাদী বলছে! এরকম লোক-ব্যক্তিবিশেষ ও দল কোন্ মাটিতে জন্ম নিয়েছেন তা নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ প্রয়োজন বৈকি! নির্বাচকরা ভোট দিয়েছেন— তাদেরই ভোটে জিতে গদীতে বসে তাদেরকেই দোষারোপ করা হচ্ছে। এটা কেউ ভেবেছেন নিশ্চয়ই।

কংগ্রেস দলের সভানেত্রীকে জিজ্ঞাসা করা দরকার— আপনি কেন এমন একজনকে বিয়ে করে বসলেন যিনি ওই ভগবা-সংস্কৃতির মধ্যে বড় হয়েছেন? রাহুলেরও যদি ইতিহাস জানা থাকে তাহলে তিনি জানতেন যে, তাঁর ঠাকুর্দা ফিরোজ খাঁন-এর পূর্বপুরুষরা পারসিক মুসলমান। এবং পারসীরা ইরান থেকে পালিয়ে এসে ভারতবর্ষে শরণ নিয়েছিল। ফিরোজ (গান্ধী) কখনও এরকম উল্টোপাল্টা কথাবার্তা বলেননি। রাহুলকে একথারও জবাব দিতেই হবে যে, ভগবা-আতঙ্কবাদীদের দেশে পারসিকরা কেন আশ্রয় নিয়েছিল? যদি ফিরোজ আজ বেঁচে থাকতেন তাহলে নাতির এরকম বালখিল্য চাপল্যে কপাল চাপড়াতেন। তাঁকে মাথায় হাত দিতে হোত।

ভারতের সরকার আর তার প্রধান দলের পেটোয়া ব্যক্তিরা প্রকাশ্যে হিন্দু সন্ত্রাস/গৈরিক সন্ত্রাস বলে কোটি কোটি হিন্দুদেরকে 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যা দিচ্ছেন। সন্ত্রাসবাদী হিন্দুদের দেশে কি তাদের আদৌ রাজত্ব করা উচিৎ? আজ সর্বসাধারণ জনতাকেও ভাবতে হবে যে, তাদেরই ভোটে জিতে রাজত্ব করে তাদেরকেই যারা সন্ত্রাসবাদী বলে সেই সকল মহাত্মাদের আর বরদাস্ত করা উচিৎ কি? দেশ এবং দেশবাসীর জন্য এর থেকে বড় অপমান আর কি হতে পারে?

কলেজ স্ট্রীট বইপাড়া জুড়ে চলেছে পাঠক ঠকানোর বিচিত্র কাণ্ড

রমাপ্রসাদ দত্ত

বইপাড়ার অনেক প্রকাশক নির্ভুল বানানে রবীন্দ্রনাথের নাম লিখতে না পারলেও রামমোহন রায়ের নাম লেখার সময় ভুল করে না। রাজা রামমোহন রায়ের ভক্তসংখ্যা হঠাৎ কি বেড়ে গেলো? রামমোহন রায়কে নিয়ে লেখা বইয়ের কি দারুণ চাহিদা? কোনওটাই নয়। উদ্দেশ্য পুরোপুরি বাণিজ্যিক। প্রতিবছর কিছু বই রামমোহন কেনে। এই রামমোহন কে তা জানার প্রয়োজন মনে করেন না প্রকাশকের লোকজন। তারা শুধু জানেন বছরে অনেক

টাকার বই কেনার সুযোগ মেলে রামমোহনের সূত্রে।

হ্যাঁ, ১৯৭২ সালে ভারত সরকারের উদ্যোগে গড়ে ওঠে রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন। সেই বছরটা ছিল রামমোহন রায়ের ২০০তম জন্মবর্ষ। তাছাড়া আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ হিসেবেও বছরটি চিহ্নিত। বই নিয়ে প্রথম মাতামাতি দেখা যায়। রামমোহন ফাউন্ডেশনের তখন অনেক প্রভাব, প্রতিপত্তি এবং সম্পদ। গোড়াপত্তনের সময়ে দক্ষিণ কলকাতার একটা বাড়ির কিছুটা অংশ ভাড়া নিয়ে কাজ শুরু। প্রকাশকরা তখন জানতেনও না ওইরকম একটা সংস্থা ভাবছে বইয়ের জন্য। যাঁরা খোঁজখবর রাখতেন তাঁর অনেকে একটা সংস্করণের সমস্ত বই বিকিয়ে দিয়েছেন। কোনও বইয়ের ২২০০ কপি কিংবা ১১০০ কপি লাইব্রেরি ফাউন্ডেশান কিনেছে। বইয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকা
কেউ-ই ছাপা বাঁধার পর বই দেখতে পাননি। ক্রেতারা দেখার সুযোগ পাননি। এডিশন সমেত সরকার কেনা মানেই নির্দিষ্ট সময়ে অর্থপ্রাপ্তি হবে। অনেক বছর এইভাবে চলার পর অনেক প্রকাশক আর গ্রন্থাগারিক বললেন, কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা কিছু প্রকাশকের ঘরে চলে যাবে
কোন যুক্তিতে? ঠিক হলে বই বেছে কেনা হবে।

সিদ্ধান্ত অনুসারে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে প্রকাশকরা প্রস্তুত হয়ে রেজিস্ট্রার অফ পাবলিকেশন দপ্তরে তিন কপি করে প্রতিটি রাইটারের বই জমা দিলেন। সেই বই থেকে রামমোহন ফাউন্ডেশন ঠিক করল কোন্ বই কত কপি কেনা হবে। প্রথম দিকে রামমোহন ফাউন্ডেশন বই কিনে উপহার দিত রাজ্যের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে। রাজ্য সরকারের কোনও ভূমিকা ছিল না। আর ঠিক হয় রাজ্য সরকারের গ্রন্থাগার দপ্তর ম্যাচিং গ্র্যান্ট অর্থাৎ রামমোহন ফাউন্ডেশনের সমান অর্থ ব্যয় করে বই কেনার জন্য। প্রতিবছর সেই অর্থ বরাদ্দ বেড়েছে। প্রকাশকরা মুখিয়ে থাকেন কার বই সরবরাহের নির্দেশ দেবে রামমোহন ফাউন্ডেশন।

প্রকাশকদের বিভিন্ন সংগঠন বই সংগ্রহ ও পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তারা কিছু অর্থ পান। আর মোড়লি করার সুযোগও থাকে। প্রকাশকদের মধ্যে অনেকে কলকাঠি আঁটেন নিপুণ কৌশলে যাতে তাঁদের প্রকাশনীর বই বেশি ঢোকে। প্রতিটি বইয়ের দাম অনুযায়ী ঠিক হয় কত কপি সরবরাহ করা হবে। আগের মতো এডিশন-সুদ্ধ কেনার রীতি পদ্ধ তি নেই। তবে গোপনে অনেক খেলা চলে। একই বই টাইটেল পেজ বদল করে পরপর কয়েক বছর সরবরাহ করেছেন— এমন প্রকাশক কম নয়। তালিকা তৈরির জন্য কমিটি আছে ঠিকই, কিন্তু তাঁরা গুণমান বিচার করেন না। সেই যোগ্যতা বা গরজ তাঁদের নেই। শুধু বোঝেন চেনাশোনা লেখক এবং দল ঘনিষ্ঠ প্রকাশকদের বই যতটা সম্ভব বেশি ঢোকাতে হবে। হয়তো সেটাই হলো অলিখিত নির্দেশ। এরকমই ঘটে প্রতিবছর।

কোন্ বই কোন্ গ্রন্থাগারে যাচ্ছে তা পাঠকদের কতটা প্রয়োজনে লাগতে পারে বিশ্লেষণ করে দেখার কোনও গরজ নেই। গ্রামীণ গ্রন্থাগারে এমন কিছু বই পৌঁছে গেলো যার কোনও পাঠক নেই। অনেক গ্রন্থাগারে বই পৌঁছেছে পোকায় কাটা বা জলে ভেজা অবস্থায়। কোন কোন গ্রন্থাগারে পাওয়া বই অযত্নে রেখেছে। কিছু বই ঠিকমতো পৌঁছায়নি। নানাভাবে ডানা মেলেছে। প্রকাশকদের পরিষ্কার বক্তব্য, আমরা বই বের করেছি। সরকার কিনতে যখন চাইল আমরা শর্ত মেনে সরবরাহ করেছি। তা কোথায় গেলো জানার প্রয়োজন নেই। বই ওজনে বিক্রি হতে পারে, সস্তায় পিস কেটে বিক্রি হতে পারে। কোন কোন ব্যক্তির সংগ্রহে চলে যাওয়ারও অসুবিধে নেই।

প্রকাশকদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, আমাদের বই কেনার ফলে একদিকে যেমন লাভ হচ্ছে, অন্যদিকে ক্ষতিও হচ্ছে। বই তো পাঠকের হাতে পৌছাচ্ছে না। লাইব্রেরির বইয়ের সংখ্যা বাড়া আর তা ব্যবহৃত হওয়া— এক ব্যাপার নয়। আমরা পাঠক না পেলে আগামীদিনে কি করবো? কারা আমাদের পাঠক হবেন? বই কিনবেন? প্রকাশকরা চান পাঠকদের কাছে পৌঁছাতে। কলকাতা বইমেলায় আমাদের কাছে সরাসরি বই নিয়ে পৌঁছে যাওয়া যেভাবে সম্ভব হয়, সেটা অন্য কোনও মেলায় দেখা যায় না। কারণ জেলা বা আঞ্চ লিক ক্ষেত্রে বই গছাবার ব্যাপারটা সক্রিয় থাকে। অংশগ্রহণকারী প্রকাশকরা আনন্দে নেচে ওঠেন বিভিন্ন লাইব্রেরির লোকজন মেলার মাঠে ঢুকলে। সেসব লাইব্রেরি কর্মীদের সরাসরি প্রস্তাব 'হাতে কত? পাতে কত?' অর্থাৎ কত ছাড় দেবেন? সেটার কত অংশ ক্যাশমেমোতে লিখবেন? কতটা হাতে দেবেন? এই অঙ্কে সব জেলা বইমেলায় চলেছে। ছবিটা বড় খারাপ। বিভিন্ন লাইব্রেরিতে সরকারি অর্থে কেনা হচ্ছে নিম্নমানের বই। প্রকাশকদের একটা বড় অংশ এ কাজে যুক্ত। তাঁরা প্রকাশকদের বিভিন্ন সংগঠনেরও মাতব্বর।
এইরকমভাবে বাণিজ্য বিস্তারের চেষ্টা প্রকাশকদের সামগ্রিক অধঃপতনের চেহারাটাই তুলে ধরে। প্রশ্ন জাগে, এভাবে আমরা কোথায়
চলেছি?

পাঠ্য-পুস্তকের প্রকাশকদের খেলা তো কম নয়। স্কুলে স্কুলে বই ধরানোর জন্য তাঁরা গুরুমশাইদের সবরকম উপঢৌকন দিতে প্রস্তুত। রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলে। প্রকাশকরা যেমন ব্যবসার প্রয়োজনে নিজেদের যে কোনও ধরনের কাজের জন্য

প্রস্তুত করেছেন, তেমনি শিক্ষকরা প্রাপ্তির হিসেব কষে নিজেদের চরিত্রের অন্ধকার দিকগুলো প্রকট করে ফেলেছেন। এরকম কাণ্ড চলেছে ব্যাপকভাবে। যা প্রতিবছরেই বাড়ছে। স্কুলে নতুন চাকরি করতে আসা শিক্ষকরাও খুব সহজেই এসব অপকর্মের ছাচে নিজেদের গড়ে নিয়েছেন। তাঁরা ছাত্র ও স্কুলের প্রতি একটুও দরদী নন। আত্মপ্রেম-পটু শিক্ষকরা সবসময় মুনাফার অঙ্ক কষছেন। স্কুলে নিশ্চি ত বেতনের পর টিউশানির ভালো আমদানি। কোন বই পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করার সময়েও প্রাপ্তিযোগ ভালো। কোনও কোনও প্রকাশক তো বেশ দাপটের সঙ্গে বলেন, প্রতিটি জেলায় অনেক স্কুলের শিক্ষক আমাদের কথামতো চলেন। সিপিএম

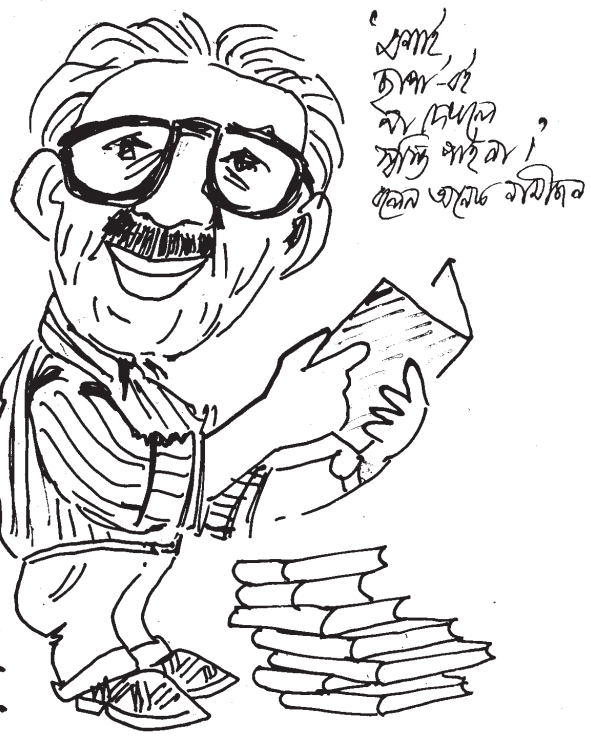

দলের বিভিন্ন দপ্তরের নেতাকে ধরাধরি করে অনেক প্রকাশক বাণিজ্য বিস্তার করেছেন। সেক্ষেত্রে নেতাকে ঠিকমতো তোয়াজ করতে পারলেই কাজ হয়। প্রকাশকরা বলছেন, বইয়ের ব্যবসাও মশাই আর পাঁচটা ব্যবসার মতো। চটপট টাকাকড়ি করতে হলে কৌশল তো করতেই হবে। সততা দেখিয়ে লাভ নেই কোনও।

এদিকে নন-টেক্সট বই নিয়ে এরকম ব্যবসা চলেছে বইপাড়ায়। আর অন্যদিকে টেক্সট বইয়ের ব্যবসা অন্যচরিত্র তুলে ধরছে প্রকাশকদের। সবক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষ ঠকে। বারবার ঠকে। প্রকাশকরা যেভাবে এগিয়ে চলতে অভ্যস্ত তাতে পাঠক ক্রেতাদের পক্ষে বড়গলায় অনেক কথা বলা হয় ঠিকই। কিন্তু আসল ছবিটা হলো, সাধারণের নাম করে তাদের বুকে বসে গলা টিপে সব আদায় করা হয়। নেতারা ওই কৌশলে কাজ হাসিল করছেন সবক্ষেত্রে। প্রাণে মারবে না, কিন্তু বেঁচে থাকাটাই বিড়ম্বিত করবে।

কলেজ স্ট্রিট পাড়া এখন সংস্কৃতি আর শিক্ষার নাম করে এমন ফাঁদ পেতেছে যা এড়াবার কোন উপায় নেই। আর নেই বলেই অনেক ফাঁক-ফাঁকির ফাঁদে পড়েও কোন প্রতিবাদ করা যাচ্ছে না। হয়তো এরকমই কাণ্ড আরও বাড়বে আগামীদিনে। কলকাতা বইমেলা নিয়ে মাতামাতির সময়ে এসব ভাবনা কারও কারও মনে উঁকি দেয় বৈকি। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা আগামীদিনে
বাড়বে কি?

সাক্ষাৎকার : ইন্দ্রেশকুমার

‘সঙ্ঘকে বদনাম করার জন্যই আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত’

❑ সাম্প্রতিককালে, ‘হিন্দু সন্ত্রাসবাদে’র সঙ্গে আপনার নাম জড়িয়ে যাবার পর, বিজেপি সভাপতি নীতিন গডকরি আপনার সমর্থনে অনেক কিছু বলেছেন। আপনি তাঁর কতটা ঘনিষ্ঠ এবং এই অভিযোগের মোকাবিলা করতে সঙ্ঘ ও বিজেপি নেতৃত্ব কি এখনও অবধি কোনও আলাপ-আলোচনা করেছেন?

● আদবানী, সুষমা, জেটলি, রাজনাথ, গডকরি— এঁরা প্রত্যেকেই আমাকে খুব ভালভাবে চেনেন। আমরা প্রত্যেকেই একে অপরের ঘনিষ্ঠ। আমরা জানি, সঙ্ঘকে বদনাম করার জন্যই এই চক্রান্ত। এই পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্ঘ এককাট্টা হওয়ার নীতি নিয়েছে। একই বিস্ফোরণের ঘটনায় এতজনের স্বীকারোক্তির কি প্রয়োজন? যদি তুমি (সি বি আই) প্রথমে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে তবে এখন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছ বলে কি করে দাবী করতে পার?

❑ অসীমানন্দ খুব নির্দিষ্টভাবে সামগ্রিক ঘটনায় আপনার যুক্ত থাকার অভিযোগ এনেছেন। প্রয়াত সুনীল যোশীর মতো অভিযুক্তের সঙ্গে আপনার সাক্ষাতের কথাও তিনি বলেছেন। তিনি এটাও বলেছেন— ওইরকম কিছু ব্যক্তির আপনি-ই ছিলেন ‘মেন্টর’ এবং আর্থিক সাহায্যদাতা।

● অসীমানন্দ নিজে যা করেছেন, সেই সম্পর্কে স্বীকারোক্তি দিতেই পারেন। কিন্তু অন্যের সম্পর্কে তিনি বলেন কেমন করে? এটা আসলে কোনও ‘স্বীকারোক্তি’-ই নয়, মন্তব্য মাত্র। তাঁর আইনজীবীও বলেছেন, চাপের মুখে তাঁকে দিয়ে বলানো হয়েছে। তারপর তাঁরা যদি আমার সঙ্গে কোনও কারণে দেখা সাক্ষাৎ করার পর ভুল কিছু করে বসেন তার দায় আমার ওপর বর্তাবে কেন? ১৯৮৪ সালে রাজীব গান্ধী একটা মন্তব্য করেছিলেন (‘যদি একটা বড় গাছ পড়ে যায়, তবে পৃথিবী কম্পিত হবেই’), তিনি তখন ছিলেন কংগ্রেসের মেন্টর। সুতরাং তাঁর ভারতরত্ন পাওয়া উচিত ছিল না জেলে যাওয়া উচিত ছিল? কংগ্রেসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা উচিত ছিল না কি শাসক দল হিসেবে মেনে নেওয়া উচিত ছিল?

❑ কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের কোনও প্রতিবাদ কি এই মুহূর্তে সাধারণের মধ্যে প্রকাশ করবেন না?

● সরকারের যদি সাহস থাকে তবে পুরো ঘটনাটাকে পাবলিক ইনভেস্টিগেশনের ওপর ছেড়ে দেওয়া হোক। প্রত্যেকেই দেখতে পাচ্ছেন, আমার কোনও ভয় নেই। রাহুল (গান্ধী)-র মন্তব্য (হিন্দু সন্ত্রাসবাদের ওপর) যেটা উইকিলিকস-এ প্রকাশিত হয়েছে তাও এই ধরনের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র থেকে। সুতরাং দিগ্বিজয় সিংহের সঙ্গে কি অনুসন্ধানকারী সংস্থার যোগাযোগ রয়েছে? কর্ণেল পুরোহিত এবং দয়ানন্দ পান্ডে, স্পষ্টতই এরা সরকারের লোক, একইসঙ্গে এরাও মূল আইনের আওতায় রয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং বিদেশমন্ত্রী-কে বলতে হবে সমঝোতা বিস্ফোরণ কাণ্ডে পাকিস্তান জড়িত ছিল কি না। তাঁরা মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাকেও এই কথাই বলেছিলেন। অথবা এতকিছু ছেড়ে আমাকে আদালতে নিয়ে চলুন। আমি জেরার জন্য প্রস্তুত। নচেৎ আপনারা গাল-গল্প তৈরি করুন। মানুষের ওপর অত্যাচার করুন।

❑ আর এস এস প্রধান মোহন ভাগবত মেনে নিয়েছেন, সঙ্ঘে কয়েকটি ‘যন্তর’ ছিল যাদের সঙ্ঘ ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে।

● ভাগবতজী বারবার বলেছেন, হিংসাশ্রয়ী মানসিকতা যাদের রয়েছে সঙ্ঘে তাদের কোনও স্থান নেই। সেই কারণে, যদি সেরকম কেউ থেকে থাকেন, তিনি সঙ্ঘে থাকতে পারবেন না। তারা নিজেদের পথ দেখবে। কিন্তু এখন মানুষ জিজ্ঞাসা করছেন এই লোকগুলো যাদেরকে নাশকতার সঙ্গে জড়িত বলে দেখানো হচ্ছে— এঁরা কি সরকারের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছেন? তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। আদালত-ই প্রকৃত কর্তৃপক্ষ। আমরা গণতন্ত্র, বিচার-ব্যবস্থা, সংবাদমাধ্যম এবং জনসাধারণ-এ বিশ্বাসী। সুতরাং এনিয়ে রাজনীতি কেন হচ্ছে?

❑ ‘হিন্দু সন্ত্রাসবাদে’র ছায়াকে আপনি কিভাবে দেখছেন?

● আমি বলবো, সন্ত্রাসবাদ ধর্মের সঙ্গে কখনওই যুক্ত হতে পারে না। হিন্দু সন্ত্রাসবাদ বলা তাই পাপ এবং একটা অপরাধ।

❑ কিন্তু সন্ত্রাসের সঙ্গে ধর্মের সহাবস্থান বিগত কয়েক বছর যাবৎ মুসলিমদের ক্ষেত্রে বিস্তারিতভাবে দেখা যাচ্ছে।

● তারা (মুসলিমরা) নিজেরাই একে ‘জেহাদ’ বলে আখ্যায়িত করেছে, এটা তাদের ভুল। আপনি একটা নামের সঙ্গে ছাপ (সন্ত্রাসের) মারতে চাইছেন কেন?

❑ আর এস এস-এ আপনার ভূমিকাটা কিভাবে সংজ্ঞায়িত করবেন?

● আমি সঙ্ঘের প্রাত্যহিক কাজের সঙ্গে যুক্ত। এটা ছাড়াও আমি যখনই কোনও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা— তা সে স্থানীয় বা জাতীয় স্তরে যেখানেই হোক না কেন, দেখি, তখন সেটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে নতুন ধরনের কর্মসক্রিয়তার মাধ্যমে তা সমাধানের চেষ্টা করি।

❑ এই কর্মসক্রিয়তার স্বরূপ কিরকম?

● আমি দিল্লীতে ছিলাম ১৯৭১ থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত। ১৯৭৯ সালে সেখানে ভয়ঙ্কর বন্যা হয়। সঙ্ঘের পক্ষ থেকে ‘বাঢ় (বন্যা) পীড়িত সহায়তা সমিতি’ গঠন করা হয়েছিল বন্যার্তদের পুনর্বাসনের জন্য। আকাশপথে আনা খাদ্য, ওষুধপত্র এবং ত্রাণসামগ্রী নৌকার মাধ্যমে বিলি-বন্টনের যে বন্দোবস্ত হয়েছিল আমি তার পুরোটা দেখভালের দায়িত্বে ছিলাম। জরুরি অবস্থার সময়, গোপনে আন্দোলন চলছিল। সঙ্ঘকে তখন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। দিল্লীতে সেই সময় সত্যাগ্রহ এবং জন-জাগরণ সংঘটিত করতে আমি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলাম। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত যুবকদের মধ্যে সঙ্ঘকাজের বিস্তারে অংশগ্রহণ করি বিশেষ করে দিল্লীর কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে যেমন— জে এন ইউ, জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে। উদ্দেশ্য ছিল যুবকদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী

মানসিকতা জাগ্রত করা এবং তাদের সামাজিক কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করা। ১৯৮৩ সালে সঙ্ঘ আমাকে জম্মু-কাশ্মীর ও হিমাচল প্রদেশে দায়িত্ব দিয়ে পাঠায়। সেখানে আমি ২০০০ সাল পর্যন্ত ছিলাম। ওই সময়েই আমি ধর্মশালায় তিববত মুক্তি আন্দোলনের সংস্পর্শে আসি। ধর্মশালাতে আমরা দ্বৈত লক্ষ্যে আন্দোলন শুরু করি— প্রথমত, তিববতের স্বাধীনতার জন্য, দ্বিতীয়ত, কৈলাস মানস সরোবরের মুক্তির জন্য। আমার প্রতিষ্ঠিত ভারত-তিববত সহযোগ মঞ্চ ১৯৯৯ সাল থেকে ভারতীয় এবং তিববতীদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। ২০০০-২০০১-এ হিমালয় অঞ্চলে একতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমি হিমালয় পরিবার বলে একটি আন্দোলনের সূচনা করি। তারপর নেপাল সংস্কৃতি পরিষদের মাধ্যমে ওখানে সনাতন পরম্পরা ছড়িয়ে দিতে ইউ পি এ, সেইসঙ্গে এন ডি এ সরকারেরও সহযোগী ছিলাম আমরা। জম্মু-কাশ্মীরে আর এস এসের জম্মু-কাশ্মীর সহায়তা সমিতির নেতৃত্বে সন্ত্রাসবাদের শিকার মানুষ-জনের জন্য আমার কাজটা ছাড়াও, মুসলিমদের সঙ্গে আমি ভালরকম আলাপচারিতা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলাম। মুসলমানরাও এর জন্য এগিয়ে এসেছিলেন, তাই ২০০২ সালে আমি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম মঞ্চ গড়ে তুলতে প্রেরণা পাই। তারা বলতো ‘মাই হিন্দুস্থান’ (আমার হিন্দুস্থান) অথবা ‘মাঈ হিন্দুস্থান’ (মাতৃভূমি হিন্দুস্থান)। এখানে মাঈ মানে ‘মা’।

❑ কবে থেকে এবং কেমন করে আপনার কর্মতৎপরতায় ‘জাতীয় নিরাপত্তা’ বিষয়টি ফোকাস হলো?

● ফিনস (ফোরাম অব্ ইন্টিগ্রেটেড ন্যাশনাল সিকিউরিটি)-এর ধারণাটা আমারই। ২০০২-০৩ সাল নাগাদ ৩০-৪০ জন মিলে এটা গড়ে তোলেন, যাঁদের মধ্যে ছিলেন আইনজীবী বল দেশাই, চন্ডীগড় পুলিশের ডি জি-পি সি ডোগরা, লেফট্যানেন্ট জেনালের শেকাটকার, লেফট্যানেন্ট জেনারেল ভি এস পাতিল, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি কোকজে, অসমের মুখ্যসচিব জে পি রাজখোয়া প্রমুখ। এঁরা প্রত্যেকেই অবসরপ্রাপ্ত। এর উদ্দেশ্য সরকারের বিরোধিতা করা ছিল না, বরং শাসক দল নির্বিশেষে যে কোনও সরকারকে সহায়তা করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। আমাদের দেশ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। আমাদের নিজেদের শক্তিশালী ও সুরক্ষিত করে তোলা দরকার। নাজমা হেপতুল্লা, অবসরপ্রাপ্ত এয়ার ভাইস-মার্শাল এইচ পি সিং, সুরেশ প্রভু, শেষাদ্রিচারী প্রমুখও ফিনসের সঙ্গে ছিলেন। এর বোর্ডে কোনও ‘ব্রান্ডেড রাজনীতিবিদ’-কে আমরা চাইনি। আমাদের সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৩ ডিসেম্বরের স্মরণে, যেদিন সংসদভবন আক্রান্ত হয়েছিল, বিপন্ন হয়েছিল জাতীয় নিরাপত্তা। ভারত-মার্কিন নিউক্লিয়ার চুক্তি

‘মরণোত্তর’ ভারতরত্ন !

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে মরণোত্তর ‘ভারতরত্ন’ দেওয়ার প্রস্তাবে দেশে জুড়ে দেখা দিয়েছে তুমুল বিতর্ক। তৃণমূল নেত্রী ও রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি এই প্রস্তাব দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন বলে খবরে প্রকাশ। মমতা অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। মমতা বলেছেন, তাঁর বক্তব্যকে বিকৃত করা হয়েছে। তিনি চিঠিতে ‘মরণোত্তর’ শব্দটি ব্যবহার করেননি।

মমতার চিঠিতে কী আছে আমরা জানি না। তবে চিঠিটির ‘ফটোকপি’ পত্রিকায় ছাপা হলে আমরা জানতে পারব প্রকৃত ঘটনাটা কি। মমতা ঠিক বলছেন, না সংবাদমাধ্যম ঠিক বলছে তা জানা যাবে। মমতা যদি তাঁর চিঠিতে ‘মরণোত্তর’ শব্দটি ব্যবহার না-ই করে থাকেন তবে যাঁরা তাঁর বক্তব্যকে বিকৃত করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা ঠোকার কথা বলছেন না কেন? কারণ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা মানে এই নয় যে সাংবাদিকেরা যা খুশি তাই লিখবেন, কোদালকে ক্ষণিত্র বলবেন, কারুর লেখা বা বক্তব্যকে বিকৃত করবেন। তাও আবার কোনও এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর চিঠিকে? কোনও সাংবাদিক এমন করে থাকলে তাঁর অবশ্যই শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু প্রশ্ন, মমতা এ ব্যাপারে নীরব কেন? তবে কী ‘ডালমেঁ কুছ কালা হ্যায়? যদি আমরা মমতার কথা বিশ্বাসও করি তাহলেও কিন্তু তিনি বিতর্ক-সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পাবেন না। কারণ এতদিন পরে নেতাজিকে ‘ভারতরত্ন’ উপাধি দানের প্রস্তাব নেতাজিকে অসম্মানেরই নামান্তর। নেতাজি তো ভারতের আপামর জনতার প্রাণের নেতা। তিনি তো ভারতেরই প্রকৃত রত্ন। তাই তিনি সরকারের দেওয়া ‘ভারতরত্ন’ উপাধি বা খেতাবের ঊর্ধ্বে। তাঁকে ‘ভারতরত্ন’ খেতাব দেওয়া মানে তাঁকে খাটো করা, তাঁকে অপমান করা। আর যদি প্রমাণ হয়, মমতা নেতাজিকে মরণোত্তর ‘ভারতরত্ন’ দেওয়ায় সুপারিশ করে চিঠি লিখেছেন প্রধানমন্ত্রীকে তবে তাঁকে ভারতবাসীর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

নেতাজিকে মরণোত্তর ‘ভারতরত্ন’ দেওয়ার হুজুগ ইতিপূর্বেও উঠেছে বহুবার। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কংগ্রেসই পেছন থেকে কলকাঠি নেড়েছে বা কংগ্রেসই ছিল উদ্যোক্তা। কারণ কংগ্রেস চাইছে নেতাজিকে মৃত প্রতিপন্ন করে তাঁকে ভারতবাসীর মন থেকে মুছে ফেলতে। তিনি হলেন কংগ্রেসের রাজনৈতিক শত্রু। অসহযোগ আন্দোলন, অহিংস আন্দোলন, আপস বা আবেদন-নিবেদনের রাজনীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না এবং ওই ধরনের আন্দোলন দ্বারা যে বৃটিশ শাসকদের এ দেশ থেকে তাড়ানো যাবে না সে ব্যাপারে তিনি ছিলেন যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। তাই পরাধীন ভারত থেকে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটাতে গান্ধীজি বা নরমপন্থীদের অহিংস আন্দোলনের পথকে বর্জন করে বেছে নিয়েছিলেন সশস্ত্র সংগ্রামের পথকে। আর এজন্য তাঁকে কংগ্রেসের গান্ধীপন্থীদের বহু অপমান করতে হয়েছে হজম। কংগ্রেসের ত্রিপুরী সম্মেলনে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনে নেতাজির কাছে গান্ধীজির মনোনীত প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়ার পরাজয় ঘটলে গান্ধীজি বলেছিলেন, “সীতারামাইয়ার পরাজয় আমার পরাজয়।” অপমানিত নেতাজি কংগ্রেস ত্যাগ করে পরবর্তীকালে গঠন করেছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লক। বিদেশের মাটিতে গড়া আজাদ হিন্দ ফৌজের এক সমাবেশে নেতাজি ‘দিল্লী চলো’র ডাক দিলে পণ্ডিত নেহরু ঘোষণা করেছিলেন স্বদর্পে, “নেতাজি সম্পর্কে গান্ধীজি ও নেহরুজির মূল্যায়ন ছিল এই। ভাবতে অবাক লাগে, এঁরা ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী!

স্বাধীন ভারতে নেতাজি অন্তর্ধান রহস্য উন্মোচনে গঠিত হয়েছিল শাহনওয়াজ, খোসলা ও মুখার্জি কমিশন। প্রথম দুটি কমিশন তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু হয়েছে এবং জাপানের রেণকোজি মন্দিরে তাঁর চিতাভস্ম সংরক্ষিত রয়েছে বলে জানিয়েছে। কিন্তু মুখার্জি কমিশন ওই দুটি কমিশনের রিপোর্ট নস্যাৎ করে জানিয়েছে, তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু হয়নি এবং রেণকোজি মন্দিরে রাখা চিতাভস্মও নেতাজির নয়। ইতিপূর্বে কয়েকবার সরকারি উদ্যোগে এদেশে রেণকোজির সেই চিতাভস্ম নিয়ে আসার আয়োজন হলেও ক্ষুব্ধ জনতার বাধায় সেই আয়োজন বা উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছে। কারণ জনতার বিশ্বাস, নেতাজির মৃত্যু হয়নি।

তাই মমতা তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী হলেও তিনি কংগ্রেসি ‘কালচার’-এ বিশ্বাসী। কাজেই আগামী বিধানসভা নির্বাচনে নেতাজিপ্রেমীদের ভোটে দাঁও মারতেই যে তাঁর এই নেতাজিকে নিয়ে রাজনীতি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি যা চাইছেন তা নেতাজিকে অবমাননার সামিল এবং এই ঘটনার পেছনে গান্ধী-নেহরু কংগ্রেসের বর্তমান চ্যালা-চামুণ্ডাদের মদত থাকাটাও অস্বাভাবিক নয়। আর “আমার চেয়ে বেশি নেতাজিপ্রেমী কে?” —এই দাবি ঔদ্ধত্যেরই পরিচায়ক এবং প্রকৃত নেতাজিপ্রেমীদের অপমানের নামান্তর। এই ঔদ্ধত্য ‘ব্যুমেরাং’ হতে পারে।

—ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।

সঙ্ঘের বিরুদ্ধে অপপ্রচার

সম্প্রতি এক দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত সিপিএমের হার্মাদ বাহিনীর সঙ্গে সঙ্ঘের যোগাযোগর ভিত্তিহীন খবরে অবশ্যই বিস্ময় লাগে। এ ধরনের কল্পিত খবর যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ ধরনের প্রতিবেদনের কোনও সত্যতা আছে কি? এহেন তাৎপর্যপূর্ণ খবর অন্য কোনও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলো না কেন? কেনই বা রাজনৈতিক মহলে এ নিয়ে কোনও চাঞ্চ ল্য ছড়ালো না? সর্বোপরি কোনও প্রমাণ ছাড়াই কিভাবে এ ধরনের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশ পায়? তাহলে যে সংবাদপত্রের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে ভুল বার্তা পৌঁছয় সে সংবাদপত্রের প্রতি মানুষের বিশ্বাস না রাখাটাই শ্রেয় নয় কি? আসলে জনসমক্ষে আর এস এস-কে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এটা অপপ্রচারের নয়া কৌশল ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু বাংলা তথা সারাদেশে সঙ্ঘের নিঃস্বার্থ ভূমিকার কথা আজ অনস্বীকার্য। জাতীয়তাবাদী সংগঠন আর এস এস হিংসাশ্রয়ী কার্যকলাপে বিশ্বাস করে না। বরং জনহিতকর কাজে সঙ্ঘের বিভিন্ন কর্মসূচীতে সঙ্ঘের প্রতি মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে তা বলা যায়। হিংসা ও প্রতিহিংসার যে রাজনীতি এ রাজ্যে বর্তমানে বজায় আছে সঙ্ঘ তার ঘোর বিরোধী। ক্ষমতার লোভেও সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা লালায়িত নয়। তাহলে ক্ষমতা করায়ত্ত করার লক্ষ্যে রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের মদতদাতাদের সঙ্গে সঙ্ঘের যোগাযোগের খবরে যে যৌক্তিকতা নেই তা সহজেই অনুমেয়।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদী সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের ব্রতই হলো রাষ্ট্রবন্দনা। এহেন সংগঠনের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবেদন স্বস্তিকার ২৭ ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদনটি অবশ্যই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। সঙেঘর বিরুদ্ধে মিথ্যা কুৎসা রটানো নতুন কিছু নয়। তবে নীরব প্রতিবাদের সঠিক মূল্যায়ন হয় না। তাহলে এ ধরনের অপপ্রচার আরও বৃদ্ধি পেলেও অবাক হবার কিছু থাকবে না। তাই সংবাদপত্রে প্রকাশিত এহেন খবরের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ হওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজনে ওই সংবাদপত্রের বিরুদ্ধেও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা চাওয়া যেতে পারে। তবে বলাই বাহুল্য যে, সন্ত্রাসবাদকে মদত দেওয়ার নেপথ্যে সঙেঘর ভূমিকার কথা নিছক চক্রান্ত ও পরিকল্পিত তা বোঝাই যায়।

—সমীর কুমার দাস, দ্বারহাট্টা, হুগলী।

কৃষিজমি ও কারখানা

অতীতে যে সোনার ভারত গড়ে উঠেছিল তা কৃষি জমির জন্য। এখানকার মাটিতে ৫ কেজি বীজ ধান থেকে সহজেই ৫ ক্যুইন্টাল ধান পাওয়া যায়। একটু মেহনত করলে ১০ ক্যুইন্টাল ধান পাওয়া যায়। কারখানা বেশিদিন চলে না। দুর্গাপুরে বহু কারখানা বন্ধ। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ইউরিয়া কারখানা দুর্গাপুরে চলেনি। জমির স্থায়ীত্ব হাজার হাজার বছর। কিন্তু কারখানার স্থায়ীত্ব ৫০/১০০ বছর।

কৃষিজমি বহু গরীব চাষীদের খাবার জোগায়। কিন্তু টাটার কারখানা টাটাদের লাভ। হাজার হাজার কোটি টাকা ভারত থেকে লাভ করে বিদেশের ব্যাঙ্ক ভরে তোলা যায় অর্থাৎ ব্যক্তিগত লাভ।

জমি থেকে খনিজ পদার্থের মতো আসল জাতীয় সম্পদ তৈরি হয়। কারখানায় একটি জিনিষ থেকে একটি জিনিষই তৈরি হয়।

১০০০ একর কৃষি জমিতে তিনবার চাষ (ধান, সরষে, ধান) করতে তিন লক্ষ কৃষি শ্রমিক কাজ পায়। অন্যদিকে টাটার কারখানায় রোজ ৩০০ শত লোক কাজ করলে বছরে এক লক্ষ নয় হাজার লোক কাজ পায়।

কৃষি জমি পরিবেশ দূষণ রোধ করে। Global Warming কমায়। কারখানা পরিবেশ দূষণ তৈরি করে। Global Warming বাড়ায়।

—ধাত্রীপদ কোঙার, কুলচণ্ডা-ভাতার, বর্ধমান।

জমি-হত্যার পর গণহত্যা

সিঙ্গুরে কারখানা হলে চেহারা বদলে যেত—এটা হার্মাদি প্রলাপ বৈ কিছু নয়। ওখানকার বহুফসলি জমি পুরুষানুক্রমে মানুষকে অন্ন জুগিয়ে আসছিল। কারখানা বন্ধের জন্য কোনও আক্ষেপ নেই কেন? প্রাচ্যের ‘শেফিল্ড’-খ্যাত হাওড়ার ফাউন্ড্রি কারখানাগুলি ইনকিলাব-এর দৌলতে বন্ধ। এছাড়াও হাওড়া-হুগলী-২৪ পরগণা এবং কলকাতা শহরতলীর গঙ্গার দু’পাড়ের কলকারখানা, বিখ্যাত ডানলপ ফ্যাক্টরি বন্ধ করে, দলীয় চামচাদের করে খাওয়ার সর্বগ্রাসী ব্যবস্থার দৌলতে শিল্পাঞ্চ ল আজ পরিত্যক্ত খণ্ডহর-শশ্মানভূমি মাত্র। সেই খালি জমিও অতি সুকৌশলে বিল্ডিং-ফ্ল্যাট বানাতে জমি-হাঙ্গরদের হাতে উপঢৌকনের মতো তুলে দেওয়া হচ্ছে এবং হয়েছে। নেতা-মন্ত্রীদের সাগরেদরা ভালোমতো কামিয়ে নিচ্ছে।

বহুফসলী জমি বাদ দিয়ে মেদিনীপুর-বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার রুক্ষ অনুর্বর জমিতে শিল্প নয় কেন? সিঙ্গুরে অসমাপ্ত কারখানায় তো ছয়শ’ একর জমিকে একপ্রকার বরবাদ করা হয়েছে।

এখন তো এলাকা দখল করতে হার্মাদদের খোলাছুট দিয়ে নেতাই-এর মতো গণহত্যা ঘটিয়ে, জনগণকে বাগ মানানোর চেষ্টা চলছে নির্বাচনের প্রাক্কালে। তবে সাধারণ মানুষকে বোকা ভাববেন না। তারাও সুযোগের অপেক্ষায় আছেন।

—আদিত্য রঞ্জন ঘটক, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগণা।

বিবেকানন্দ পাঠচক্রের উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দ মিলন মেলা

সংবাদদাতা ।। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বিবেকানন্দ পাঠচক্র আয়োজিত এবং রামকৃষ্ণ মিশন, স্বামীজীর পৈতৃকগৃহ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে কলকাতার সিমলা ব্যায়াম সমিতি প্রাঙ্গণে ২২ থেকে ২৬ জানুয়ারি পাঁচ দিন ব্যাপী বিবেকানন্দ মিলন মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে মেলার উদ্বোধন করেন স্বামী নিত্যতৃপ্তানন্দ। উদ্বোধনী ভাষণে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দ মহারাজ বলেন, আজ সারা পৃথিবীতে সন্ত্রাসবাদী দানবশক্তি বিরাজ করছে, যাদের ‘মরালিটি’ নেই ‘এথিক্স’ও নেই। আমাদের মতো সারা পৃথিবীতে আর্থিক সঙ্কটের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক সঙ্কটও বড় বেশি করে দেখা দিয়েছে। সারা বিশ্বে মানুষ তাই সুখে নেই। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদা মা এবং বিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথই এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায় বলে মহারাজ মনে করেন।

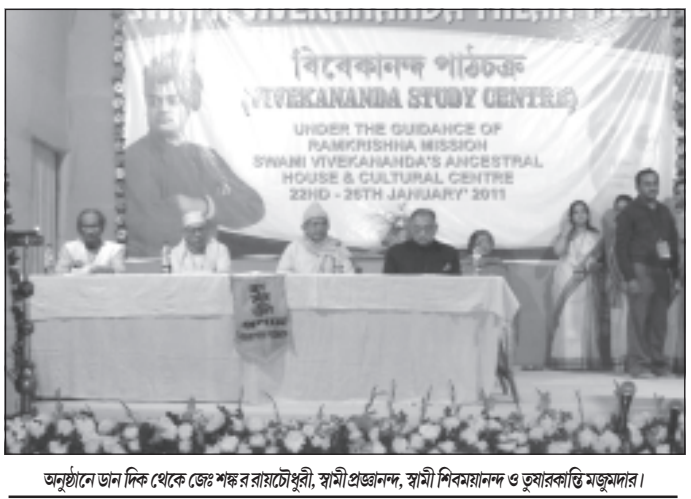

অনুষ্ঠানে ডান দিক থেকে জেঃ শঙ্কর রায়চৌধুরী, স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, স্বামী শিবময়ানন্দ ও তুষারকান্তি মজুমদার।

স্বাগত ভাষণে বিবেকানন্দ পাঠচক্রের সভাপতি তুষারকান্তি মজুমদার প্রাবন্ধিক লেখক রামচন্দ্র গোহ লিখিত “মেকার্স অফ মডার্ন ইন্ডিয়া’র সমালোচনা ক’রে বলেন, আধুনিক ভারত গঠনে স্বামীজীর অগ্রণী ভূমিকাকে অস্বীকার করে সত্য ইতিহাসকে বিকৃত করার জন্য শ্রীগোহ প্রয়াসী হয়েছেন। দুঃখের কথা কলকাতা তথা বাংলার লেখক, সাহিত্যিক, বুদ্ধি জীবী সমাজ, ঐতিহাসিকগণ প্রতিবাদ না করে নীরব থেকেছেন। এক্ষেত্রে দেশবাসীর কাছে ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ মহারাজ। তিনিই একমাত্র শ্রীগোহ-র পুস্তকের বিষয়বস্তুর সমালোচনা করেছেন। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় জেনারেল শঙ্কর রায়চৌধুরী ছাত্র যুব সমাজকে স্বামীজীর সাহস, ত্যাগ, দেশপ্রেম ও সেবার মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হবার আহ্বান জানান। সভাপতির ভাষণে বিবেকানন্দ মিলন মেলার মুখ্য উপদেষ্টা, রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃকগৃহ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দ মহারাজ বলেন, বিবেকানন্দ প্রদর্শিত সমাজসেবার মধ্য দিয়ে আমাদের অন্তর্নিহিত আত্মিক তথা আধ্যাত্মিক চেতনার জাগরণ ও প্রসার ঘটানোর নিরন্তর চেষ্টাই আজকের বিক্ষুব্ধ ও হতাশ যুবমানসে এক গতিশীল প্রেরণার জন্ম দেবে। বিবেকানন্দ পাঠচক্রের সাধারণ সম্পাদক সুদীপ দত্ত সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চ লন করেন। তিনি ছাড়াও পাঠচক্রের কার্যকর্তা দাশরথি নন্দী, সুভাষ ভট্টাচার্য, ডাঃ জয়দেব কুণ্ডু, ডাঃ তপন পাল, ভরত কুণ্ডু, সুব্রত কুণ্ডু, পঙ্কজ ঘোষ, শঙ্কর ঘোষ প্রমুখ সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। মেলায় প্রতিদিন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা হয়। সংস্কার ভারতীর শিল্পীরা একদিন ‘গীতি আলেখ্য’ পরিবেশন করেন। সব মিলিয়ে এই মেলা উত্তর কলকাতার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক নতুন সংযোজন।

সঙ্ঘকে বদনাম করার চক্রান্ত

(৯ পাতার পর)

নিয়ে ফিনস একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে এবং এর থেকে লাভ ওঠানো বিজেপি ও কংগ্রেসী সাংসদদের একটি তালিকাও প্রকাশ করা হয়। পাশাপাশি, নিঃশব্দে সরকার এবং বিরোধী উভয়পক্ষকেই এর কার্যকরী প্রত্যুত্তর (এফেকটিভ ফীডব্যাক) দেওয়ার বন্দোবস্ত করেছিলাম আমরা।

(সৌজন্যে : ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস)

বিদ্যার দেবী বীণাপাণি

নবকুমার ভট্টাচার্য

মাঘী শুক্লা পঞ্চ মীতে সর্বশুক্লা সরস্বতী তথা বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী বাগদেবীর আরাধনা। সর্বপ্রকার শ্রীর আধার মা সারদার পুজোর প্রশস্ত তিথিবলে এই পঞ্চমীকে শ্রীপঞ্চমী বলা হয়। বীণারঞ্জিত পুস্তক হস্তে— এই দেবীর নাম বীণাপাণি। সরস্বতী কে? ঋষিরা বলেছেন, সরঃ এক অর্থে জল এবং সেকারণেই সরস্বতীর প্রথম অর্থ নিঃসন্দেহে জল বা নদী। আর্যাবর্তে প্রবাহিতা নদী সরস্বতী পূজিতা হতেন প্রথমে দেবীরূপে। সরস্বতীকে ঘিরেই বৈদিক যুগে কৃষি শিল্প বাণিজ্য জ্ঞান ও কলাবিদ্যার বিস্তার ঘটেছিল। ক্রমে সরস্বতী হলেন জ্ঞানদাত্রী।

সরস শব্দের আরেক অর্থ জ্যোতি। তাই সরস্বতী অর্থে জ্যোতির্ময়ী। ক্রমে সরস্বতী

পরম্পরা

অন্য বৈশিষ্ট্যগুলি বিসর্জন দিয়ে কেবল মাত্র বিদ্যার দেবী, জ্ঞানবিদ্যার অধিশ্বরীতে পরিণত হন। হিন্দু সংস্কৃতির সীমা ছাড়িয়ে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের পুজোর আসনেও তিনি অধিষ্ঠিতা হন। দেবী সরস্বতী জ্যোতি বিভূতি এবং নদী সরস্বতীর নিষ্কলুষ স্বচ্ছতা— এই উভয়ের সমন্বয়ে দেবী হন শ্বেতবর্ণা। তাঁর বসনভূষণ ও বাহনেও সর্বশুক্লার উপস্থিতি। নির্মল জ্ঞানের দেবতা, অজ্ঞাননাশিনী ও মলিনামুক্ত বলে তিনি শুভ্রা। জলময়ী নদী সরস্বতী জ্ঞানের উদ্দীপনাকারিণী হওয়ার সুবাদে হলেন বাগ্‌দেবী। আসলে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়— এই তিন কর্মের অধিদেবতারূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর রূপের কল্পনা পুরাণ সাহিত্যে স্থান লাভ করেছে। এঁদের শক্তিত্রয়ী ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও রৌদ্রী— একই শক্তির ত্রিধা প্রকাশ বলে প্রচলিত। এভাবে ব্রাহ্মণী অর্থাৎ সরস্বতী। বৈষ্ণবী অর্থাৎ লক্ষ্মী ও মাহেশ্বরী অর্থাৎ দুর্গা একই শক্তির তিনরূপ। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মতে সরস্বতী শ্রীকৃষ্ণের মুখগহ্বর থেকে নিঃসৃত হয়েছিলেন এবং তাঁরই আদেশে তিনি বিষ্ণুর স্ত্রী হয়েছিলেন। সরস্বতী তাই বিষ্ণুভার্যা এবং বিষ্ণুজিহ্বা নামেও পরিচিত। তাঁর রূপেরও কোনও সীমা পরিসীমা নেই। এজন্যই তাঁর আর এক নাম শতরূপা। তবে সামগ্রিক ভাবে দেবী সরস্বতীর রূপাখ্যানে পবিত্রতা ও বিশুদ্ধ তার ভাবকল্পনা বিধৃত। সরস্বতীর আরাধনার ক্রমবিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রূপকল্পনাতেও বৈচিত্র্য দেখা যায়।

পুরাণে দেবীর রূপ শুভ্রবর্ণা আর বেদে তা ছিল দিব্যবর্ণা। ঋষি বশিষ্ঠের ধ্যাননেত্রে সরস্বতী শুভ্রা। মৎস্যপুরাণে (৬৪/১০) বীণা, কমণ্ডলু, অক্ষমালা ও পুস্তক চার হাতে শোভিতা দেবীকে পঞ্চ মী তিথিতে আরাধনা করতে বলা হয়েছে। অগ্নিপুরাণে (৫০ অ.) দেবী পুস্তকাক্ষমালিকাহস্তা, বীণাহস্তা, সরস্বতী। সারদাতিলকতন্ত্রে তাঁর ধ্যানমন্ত্রে তিনি শুভ্রকান্তি, কুচভারাবণতা, চন্দ্রশেখরা, লেখনী ও পুস্তক হাতে দ্বিভুজা, শ্বেতপদ্মাসীনা ও ধনসম্পদ রক্ষাকারী। তন্ত্রসারের অপর একটি ধ্যানে ইনি হংসবাহনা। এঁর চার হাতে বীণা, অক্ষমালা, সুধাপূর্ণ কলস ও পুস্তক। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে সরস্বতীর হাতে রয়েছে কমণ্ডলু যা ব্রহ্মার চিহ্ন ও ব্যাখ্যান মুদ্রাসহ বীণা। কালিকাপুরাণে চতুর্ভুজা দেবীর হাতে কখনও থাকে বীণা, পুস্তক, অক্ষমালা ও কমণ্ডলু আবার কখনও বরদ অভয়মুদ্রা। অক্ষমালা ও পুস্তক। অবশ্য তন্ত্রের বর্ণনায় সরস্বতীর হাতে বীণা খুব একটা দেখা যায় না। তন্ত্রে দেবীর বর্ণ পঞ্চ াশ রকমের। কোথাও রয়েছে জবাফুলের ন্যায় দেবীর পঞ্চ বদন। কোথাও আবার সিন্দুরের ন্যায় রক্তবর্ণা। কোথাও নীল এবং মহানীল সরস্বতীর উল্লেখ রয়েছে। কোনও কোনও পুরাণ মতে মাঘ মাসে শুক্লা পঞ্চ মী তিথিতে সরস্বতী পুজো চালু করেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। 'মাঘস্য শুক্লা পঞ্চ ম্যাং বিদ্যারম্ভ দিনে পি চ'— এ নাকি তাঁরই বিধান। এই বিধান শ্রীকৃষ্ণের হলেও স্মার্ত গ্রন্থে বলা হয়েছে, সরস্বতী পুজোর দিন বিদ্যা আরাধনা শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ। সংবৎসর প্রদীপে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— মস্যাধরং লেখনীঞ্চ পূজয়েন্ন লিখেত্ততঃ। অর্থাৎ এদিন দোয়াত ও কলমের পুজো করবে কিন্তু লিখবে না। ওই গ্রন্থের অন্যস্থানে শ্রীদত্ত ধৃত বচন উল্লেখ করে বলা হয়েছে— 'শ্রীপঞ্চ ম্যাং লিখেন্নৈব ন স্বাধ্যায়ং কদাচন। বাণীকোপমবাপ্নোতি লিখনে পঠনে অপি।' অর্থাৎ শ্রীপঞ্চ মীতে লিখবে না, পড়বেও না। ওই তিথিতে লিখলে বা পড়লে সরস্বতীর কোপ *সরস্বতী পুজো উপলক্ষে প্রকাশিত।।*

সরকারি অবহেলায় দীনবন্ধু মিত্রের বাড়ি আজ ভগ্নস্তূপ

অপূর্ব দাস ॥ ১৯ শতকে যাঁর কালজয়ী উপন্যাস 'নীল দর্পন' গোটা বাংলাকে আলোড়িত আন্দোলিত করেছিল, সেই মানুষটির বাড়ি এখন কার্যত ধবংসস্তূপ। কয়েকটি দেওয়াল ছাড়া বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট নেই। দীনবন্ধু মিত্রের বংশধরদের কেউ কেউ এখন বাড়ি সংলগ্ন জমিতে নতুন বাড়ি তৈরি করে বসবাস করছেন। এই বাড়িটি রয়েছে উত্তর ২৪পরগণা জেলার বনগাঁ মহকুমার চৌবেড়িয়া গ্রামে। ১৮২৯ সালে পৃথিবীর আলো দেখার পর এই বাড়িতেই থাকতেন দীনবন্ধু। পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত এখানেই ছিলেন। গ্রামের পাঠশালাতে পড়তেন। পরবর্তী অধ্যায়ে কলকাতায় চলে যান এবং সেখানেই পড়াশোনা করেন।

প্রায় সাড়ে তিনশো বছরের পুরানো এই বাড়িটি। এখন সেই বাড়িতে ঢুকলেই গা ছমছম করবে। চারিদিকে বুড়ো গাছপালার বাড়বাড়ন্ত জঙ্গলের রূপ নিয়েছে। পুরানো বাড়িটির সংলগ্ন জায়গাতেই এখন আলাদা বাড়ি করেছেন দীনবন্ধু মিত্রের বংশধর সঞ্জিৎ মিত্র। তিনি রাজ্য সরকারের পূর্ত বিভাগের কর্মী। সঞ্জিৎবাবু জানালেন এই বাড়িটিকে ন্যাশনাল হেরিটেজ-এর মর্যাদা দেওয়ার জন্য তাঁরা বারবার রাজ্য সরকারের নানামহলে যোগাযোগ করেছেন। আবেদন নিবেদনও কম হয়নি। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। সঞ্জিৎবাবু আরও জানালেন, বনগাঁর প্রাক্তন বিধায়ক সৌগত রায় বেশ কয়েকবার এখানে এসেছিলেন। এই বাড়িটি যাতে ন্যাশনাল হেরিটেজ-এর মর্যাদা পায় তার জন্য চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু কিছুই হয়নি। তিনি আরও জানালেন তাঁর বাবার ঠাকুরর্দা ছিলেন দীনবন্ধু মিত্র। অথচ বংশধর হয়েও তিনি এ বিষয়ে কিছুই করতে পারছেন না। এজন্য এক অব্যক্ত যন্ত্রণা তাঁকে কুরে কুরে খাচ্ছে। এখন ভাবাই যাবে না, এই বাড়িটিতে এক সময় তিনশোর বেশি ঘর ছিল।

চৌবেড়িয়ায় দীনবন্ধু মিত্রের পৈত্রিক বাড়ির সামনে তাঁর মূর্তি।

সঞ্জিৎবাবু আরও জানালেন, গত ২০ এপ্রিল একটি নোটিশ জারি করে ওয়েস্ট বেঙ্গল হেরিটেজ কমিশন। ওই নোটিশে আটটি স্থানকে ঐতিহ্যশালী বলে উল্লেখ করা হয়। ওই স্থানগুলির মধ্যে তিন নম্বরে ছিল দীনবন্ধু মিত্রের এই বাড়িটি। নোটিশ পাওয়ার পর মিত্র পরিবারের তরফ থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় এবং বাড়িটির আমূল সংস্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাদের লিখিত মতামত জানানো হয়। কিন্তু তারপর প্রায় ৬৮ মাস কেটে গেলেও কিছুই হয়নি। সব দেখেশুনে হতাশ সঞ্জিৎবাবু এখন রেলমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছেন।

নীলকণ্ঠ

চিরন্তন চক্রবর্তী।। মহাভারতের প্রসিদ্ধ টীকাকার নীলকণ্ঠ পণ্ডিত সমাজে সুপরিচিত। তাঁর রচিত একাধিক গ্রন্থ আজও তাঁর পাণ্ডিত্যের নিদর্শনরূপে বর্তমান। তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে যে পরিচয় লিপিবদ্ধ রয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, তিনি এক শৈব বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নীলকণ্ঠের প্রপিতামহ ময়ূরেশ্বরের সময় হতেই বংশের নতুন পদবি হয় শৈব এবং তিনিও পরিচিত হন শৈব নীলকণ্ঠ নামে। নীলকণ্ঠের পিতামহের নামও নীলকণ্ঠ। পিতার নাম রঙ্গনাথ ও মাতার নাম লক্ষ্মী। তিনি তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে দুই গুরু কাশীনাথ ও শ্রীধর এবং রত্নজী নামে এক পৃষ্ঠপোষকের নামও উল্লেখ করেছেন। এই রত্নজীর সহায়তায় তিনি দেবীভাগবতের টীকা রচনা করেছিলেন। এই টীকায় শক্তি উপাসনার রহস্য বর্ণিত হয়েছে। তাঁর মতে দেবী ব্রহ্মস্বরূপা— সর্ববেদান্ততাৎপর্যভূমি। দেবী ব্রহ্মবিদ্যাধিষ্ঠাত্রী —জীবদশার নাশই এই বিদ্যার লক্ষ্য। তাই দেবীর সম্মুখে পশুবলির ব্যবস্থা। নীলকণ্ঠের মতে এটাই পশুবলির তাৎপর্য।

নীলকণ্ঠ মহারাষ্ট্রদেশে জন্মেছিলেন বলে মনে করা হয়। তবে তিনি কোন সময় জন্মেছিলেন তা কোথাও নির্দেশ করেননি। তবে তিনি তাঁর গ্রন্থে যে সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নামের উল্লেখ করেছেন, তা থেকেই তাঁর আবির্ভাবকাল মোটামুটি অনুমান করা যেতে পারে। এই অনুমান থেকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নীলকণ্ঠ খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে আবির্ভূত হননি। দেবীভাগবতে নীলকণ্ঠের টীকায় ১৫৮৯

ভারতের শাশ্বত মনীষা

খৃস্টাব্দে রচিত মহীধর কৃত মন্ত্রমহোদধি ও ১৭৪১ সালে রচিত ভাস্কর রায় কৃত গুপ্তবতী এবং ১৭শ— ১৮শ শতাব্দীর নাগোজী ভট্টের উল্লেখ রয়েছে। নীলকণ্ঠের ধারণা ছিল তিনিই নাকি দেবীভাগবতের প্রথম টীকাকার। তাই দেবীভাগবতের প্রতি স্কন্ধের শেষে তিনি সে কথার উল্লেখ করেছেন। তবে মহাভারতের টীকাকার হিসেবে তিনি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

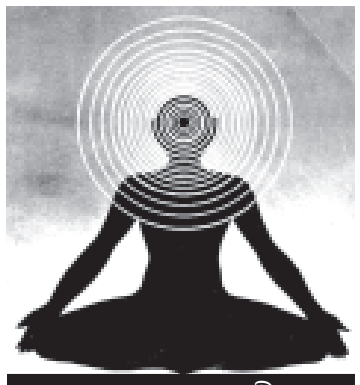

বঙ্গদেশে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ (১৮৭৬-১৯৬১) সম্পাদিত বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত মহাভারতের মূল ও নীলকণ্ঠের টীকা প্রকাশিত হয়েছে। এই মহাভারতের আদিপর্ব প্রথম খণ্ড প্রকাশের তারিখ ১৩৩৬ সালের ১লা পৌষ এবং নীলকণ্ঠের টীকাসহ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ কৃত মহাভারত গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে কলেজ স্ট্রীট পাড়ার 'বিশ্ববাণী প্রকাশনী' থেকে।

কেরিয়ারের ঠিক-ঠিকানা

নৌবাহিনীতে নাবিকপদে অ্যাপ্রেন্টিস নিয়োগ

নীল উপাধ্যায়

ভারতীয় নৌবাহিনী আর্টিফিসার অ্যাপ্রেন্টিস (এএ)-১৩০ ব্যাচে নাবিক নিয়োগের জন্য অবিবাহিত তরুণ প্রার্থীদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করছে। ২০১১ সালের আগস্ট-এ কোর্স শুরু।

প্রার্থীর যোগ্যতা ঃ প্রার্থীর জন্ম হতে হবে ১ আগস্ট ১৯৯১ থেকে ৩১ জুলাই ১৯৯৪-এর মধ্যে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অঙ্ক, ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি/বায়োলজি/কম্পিউটার সায়েন্স এই তিন বিষয়ের মধ্যে যে কোনও একটিতে ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে ১০+২/সমতুল পাশ।

শারীরিক সক্ষমতা ঃ IHQ MOD (Navy) in No (Spl.) 01/2008 অনুযায়ী শারীরিক সক্ষমতার অধিকারী হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রার্থীকে মানসিকভাবেও সুস্থ থাকতে হবে। হৃদরোগ এবং নাক কান চোখের অপারেশনজনিত সমস্যা থাকলে প্রার্থী বিবেচিত হবেন না।

উচ্চতা ও ওজন ঃ উচ্চতা কমপক্ষে ১৫৭ সেমি/ওজন ও বুক উচ্চতার সঙ্গে সমানুপাতিক।

দৃষ্টিশক্তি ঃ চশমা ছাড়া ৬/১২ ভালো চোখ। চশমাসহ ৬/৯ ভালোচোখ, ৬/১২ খারাপ চোখ বলে গণ্য হবে। ইতিপূর্বে আর্মড্ ফোর্স মেডিকেল পরীক্ষায় অসফল প্রার্থীদের আবেদন না করাই বাঞ্ছনীয়।

কীভাবে আবেদন ঃ (১) এ৪ সাইজের সাদা বন্ড পেপারে নির্দিষ্ট ফরমাট অনুযায়ী এক কপি জেরক্স সমেত আবেদন করতে হবে। ফরমাট পাওয়া যাবে www. nausenabharti.nic.in ওয়েবসাইটে, (২) নিয়োগের নাম, কেন্দ্রের নাম, ১০+২ পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের শতাংশ সাদা খামের ওপর পরিষ্কার করে লিখতে হবে। উদাহরণ ঃ ট্রেড-১৩০ ভুবনেশ্বর-৬৮.৭ক্ষ ছ১০+২গ্ধ, (৩) আবেদনপত্রে বর্ণিত সমস্ত প্রশংসাপত্রের প্রত্যয়িত নকল আবেদনপত্রের সঙ্গে দিতে হবে, (৪) দিতে হবে সম্প্রতি তোলা এককপি রঙিন ছবি, যার উল্টো পিঠে প্রার্থীর নাম ও সই থাকা চাই। ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড নীল রঙের হওয়া বাধ্যতামূলক। কম্পিউটার থেকে নেওয়া/ ডিজিটাল ছবি গ্রহণযোগ্য

(এরপর ১৪ পাতায়)

।। চিত্রকথা ।। পরশুরাম ।। ২৩

হাজার হাতে অস্ত্র সমেত কার্তবীর্য বের হলেন।

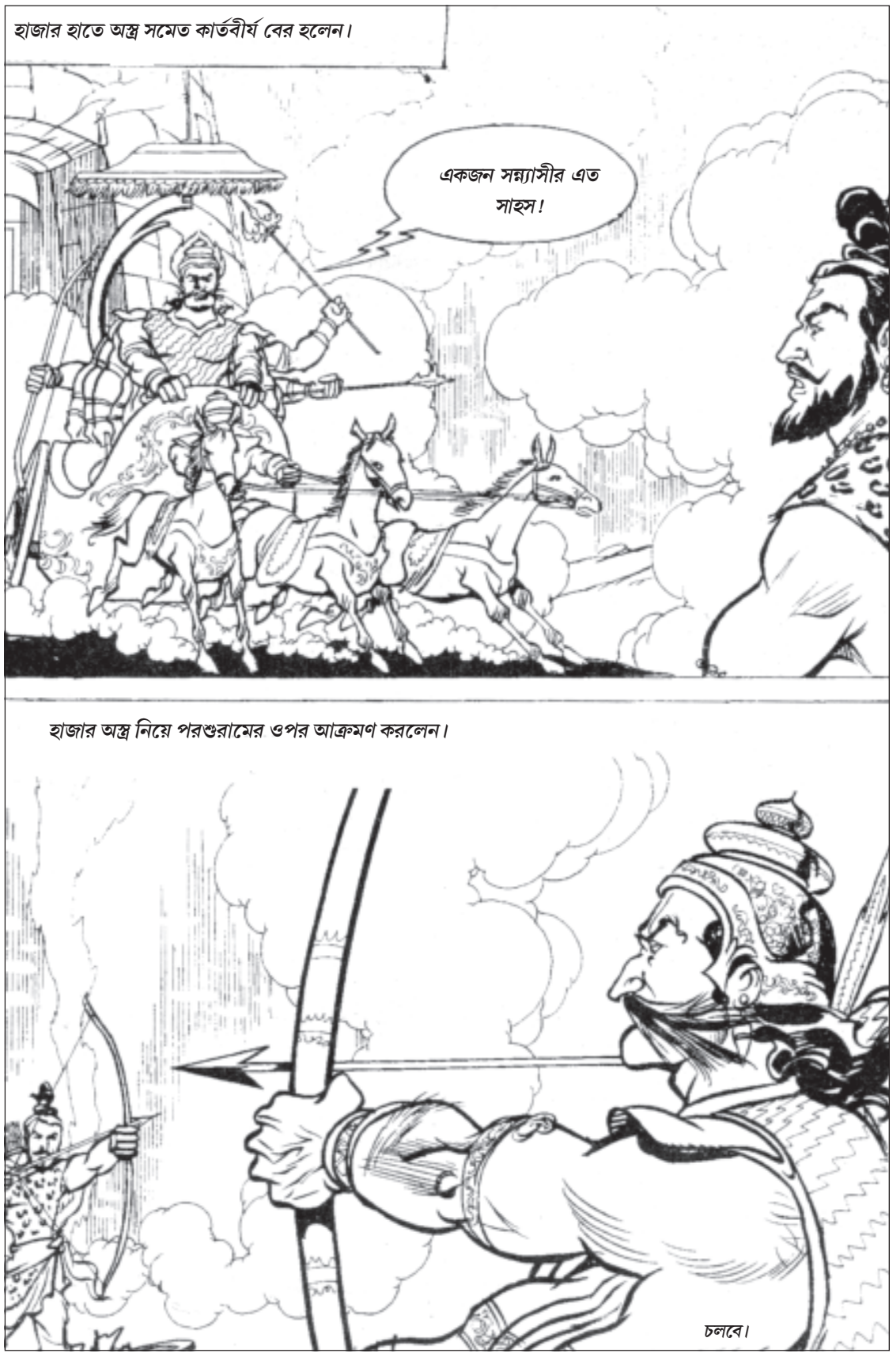

হাজার অস্ত্র নিয়ে পরশুরামের ওপর আক্রমণ করলেন।

জীবনে বিজ্ঞান

।। নির্মল কর।।

মায়ের কথা

জন্মের ২৪ ঘন্টার মধ্যে মায়ের কথা শোনাতে হবে নবজাতককে। বলেছেন মন্ট্রিল বিশ্ববিদ্যালয় ও সেন্ট জাস্টিন বিশ্ববিদ্যালয় এবং হাসপাতাল ও গবেষণা কেন্দ্রের গবেষকেরা। গবেষক প্রধান ডাঃ মেরিসি ল্যাসোন্ড মনে করেন, জন্মের পরেই মায়ের 'অ' 'অ' শব্দ পৌঁছে যায় শিশুর মস্তিষ্কে। ১৬টি নবজাতকের মস্তিষ্কে ইলেক্‌ট্রোড প্রয়োগ করে এক্ষেত্রে তাঁরা নিশ্চিত হয়েছেন। তাঁদের অভিমত, কোনও সেবিকার নয়, জন্মের পর অবশ্যই শোনাতে হবে মায়ের কথা।

জিনই সব

অনেকের মধ্যে সাধারণ সব ব্যবসায়িক বুদ্ধি থাকে। যোগ্যতার নিরিখেও সেরা হন তাঁরা। বিষয়টা কিন্তু সম্পূর্ণ জিনগত ব্যাপার। ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব্ টেক্নোলজির নতুন এক গবেষণা বলছে 'মিডিয়াস টাচ্' নামক এই জিনটি বলে দেয় কে বড় ব্যবসায়ী হবে ভবিষ্যতে। বিপজ্জনক ব্যবসায়িক চুক্তিও এক নিমেষে করে দেওয়া সম্ভব হয়। দায়ী কিন্তু এই জিনই।

চেরি—ক্যানসার হৃদ্‌রোগ তাড়াতে

চেরি ফলের অনেক গুণ। গাঢ় রঙের জন্য চেরিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট। চেরি ক্যানসার ও হৃদ্‌রোগের সম্ভাবনা কমায়, ত্বক নরম রাখে। চেরি নিয়মিত খেলে বয়সজনিত সমস্যাগুলো সহজে মাথাচাড়া দিতে পারেনা। মিষ্টি হলেও চেরিতে আছে স্বল্প পরিমাণ ক্যালোরি।

চুল চেনাবে অপরাধীকে

অপরাধীরা সাবধান! অস্ট্রিয়ার একদল বিজ্ঞানী প্রায় ৩০ হাজার রকমের চুল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, শুধু আঙুলের ছাপ নয়, চুলের চুলচেরা পরীক্ষা করলে রহস্যের কিনারা করা সম্ভব। রক্তপরীক্ষার মতো চুল পরীক্ষা করে পিতামাতার পরিচয় নির্ধারণও সম্ভব। গবেষণায় এ পর্যন্ত আট রকম চুলের রঙ, পাঁচরকম চুলের বহিরাবরণ এবং আট রকমের অভ্যন্তরীণ গঠনযুক্ত চুল পাওয়া গেছে।

মনে রাখা

আলঝাইমার রোগীদের জন্য সুখবর। একটি সাধারণ রক্তপরীক্ষা বলে দেবে, ভুলে যাওয়া রোগটি দশ বছর পুরনো নাকি বয়সজনিত। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে, রক্তে অতিরিক্ত প্রোটিন স্মৃতিভ্রমকে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসে। লন্ডনের কিংস কলেজের বিজ্ঞানীরা এর ওষুধও আবিষ্কার করে ফেলেছেন। এই রোগের রক্ত পরীক্ষাও খুব ব্যয়সাপেক্ষ নয়।

র/ঙ্গ/কৌ/তু/ক

মালিক (ড্রাইভারের চাকরির ইন্টারভিউ নেওয়ার পর)— ঠিক আছে কাল থেকে আসুন, স্টার্টিং স্যালারি ৪০০০ টাকা।

ড্রাইভার ঃ আর ড্রাইভিং স্যালারি কত?

* * *

মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গিন্নি একটা বিকট শব্দ শুনে স্বামীর ঘরে ছুটে এসে— কিসের শব্দ?

মোঃ নাসিরুদ্দিন ঃ জোববাটা মাটিতে পড়ে গিয়েছিল।

গিন্নি ঃ তাতেই এত আওয়াজ?

মোঃ নাসিরুদ্দিন ঃ আমি জোববাটার ভেতরে ছিলাম যে!

* * *

আন্টি ঃ তোমার ভাই সিঁড়িভাঙা অঙ্কে এত ভালো, তুমি কেন এই অঙ্কগুলো পার না?

ছাত্র ঃ সিঁড়ি ভাঙতে আমার পায়ে খুব ব্যথা হয়, আন্টি।

* * *

নিতু ঃ ট্রামে-বাসে বয়স্করা দাঁড়িয়ে থাকে, আর ইয়াংরা নির্লজ্জের মতো বসে থাকে, এটা অসহ্য।

জিতু ঃ বুঝলাম। তুই কী করিস?

নিতু ঃ আমি জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকি।

* * *

ছেলে ঃ মা, রথের দিনে সব সময় বৃষ্টি হয় কেন?

মা ঃ বৃষ্টির দিনে সব সময় রথ বলে!

—নীলাদ্রি

ম গ জ চ র্চা

১। কোন্ রেনফরেস্টের নাম পৃথিবীর ফুসফুস?

২। ভারতের সংবিধানের রূপকার, যিনি প্রথম সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত হন। কে তিনি?

৩। শ্রীরামকৃষ্ণ বঙ্কিমচন্দ্রের কোন্ উপন্যাসের কিছুর অংশের পাঠ শুনেছিলেন?

৪। কোন্ বিখ্যাত ব্যাণ্ডের গাড়ির বনেটের উপরে থাকে একটি পরীর মূর্তি?

৫। সিলি পয়েন্ট, ড্রপ, ফকি— এর মধ্যে কোন্ শব্দটি ব্যাডমিন্টন খেলার সঙ্গে যুক্ত?

—নীলাদ্রি

উত্তর ঃ

১। আমাজন রেনফরেস্ট

২। বি আর আম্বেদকর

৩। দেবী চৌধুরানী

৪। রোলস রয়েস

৫। শাটল

হাসনাবাদে বিশাল সভায় প্রাক্তন সরসঙ্ঘচালক কে এস সুদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ “কংগ্রেসই জিন্নাকে ‘মুসলিম নেতা’ বানিয়েছে। জিন্না তো কংগ্রেসেই ছিলেন। পরে তিনি মুসলিম লীগের নেতা হয়ে ‘পাকিস্তান’ আদায় করেছেন। অসংখ্য হিন্দুদের উপর অকথ্য নির্যাতন হয়েছে। সঙ্ঘের কাজ তখন বিশেষ ছিল না। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াসেই পাকিস্তান ভাগ করে পশ্চিমবঙ্গ ও পশ্চিম পাঞ্জাব ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়।”

উপরোক্ত বক্তব্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নিবর্তমান সরসঙ্ঘচালক শ্রী কে এস সুদর্শনের। তিনি গত ৩০ জানুয়ারি উত্তর ২৪ পরগণার (সঙ্ঘের যোজনায় বসিরহাট জেলা) বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া হাসনাবাদের স্পোর্টিং এসোসিয়েশনের ফুটবল মাঠে স্বয়ংসেবক ও নাগরিকদের এক বিশাল সমাবেশে বক্তব্য রাখছিলেন। উপস্থিত প্রায় দেড়হাজার পূর্ণ গণবেশ পরিহিত স্বয়ংসেবকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, একদিন গণবেশে অনুষ্ঠানে যোগ দিলেই স্বয়ংসেবক নয়। রোজ শাখায় যেতে হবে, স্বয়ংসেবকত্ব অর্জন করতে হবে। তবেই হবে সঙ্ঘের কাজ। বাস্তবে এটাই ছিল স্বয়ংসেবকদের প্রতি শ্রদ্ধেয় সুদর্শনজীর এরকম নির্দেশ।

৩০ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ন’টায় সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র কার্যালয় কেশব ভবন থেকে শ্রী সুদর্শনজীর কনভয় (সরকারি পাইলট ভ্যান সহ) হাসনাবাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন, প্রান্ত সঙ্ঘচালক অতুলকুমার বিশ্বাস, ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (মাঃ সুদর্শনজীর সঙ্গে একই গাড়িতে), প্রবীণ প্রচারক কেশবরাও দীক্ষিত, প্রাক্তন ক্ষেত্র-প্রচারক সুনীলপদ গোস্বামী, বর্তমান ক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত, ক্ষেত্র কার্যবাহ সত্যনারায়ণ মজুমদার, প্রান্তপ্রচার প্রমুখ সুব্রত চট্টোপাধ্যায় এবং সহ প্রান্ত প্রচারক বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

হাসনাবাদের পথে কনভয় যখন বসিরহাট ঢোকার মুখে ত্রিমোহিনীতে পৌঁছাল, গণবেশ পরিহিত স্বয়ংসেবকরা সত্তরটি মোটর সাইকেলে গৈরিক পতাকা লাগিয়ে তখন রীতিমতো এসকর্ট করে হাসনাবাদ পর্যন্ত নিয়ে যান। হাসনাবাদে সোজা স্বাগত সমিতির সম্পাদক তারকনাথ ঘোষের বাড়িতেই ওঠেছিলেন সুদর্শনজী। বাড়ির মা-বোনেরা শঙ্খধবনি ও উলুধবনি সহকারে সুদর্শনজীকে স্বাগত করেন। বাড়ির মন্দিরে গৃহদেবতাকে প্রণাম করে তিনি ঘোষ বাড়িতে প্রবেশ করেন। প্রায় বারো’শ স্বয়ংসেবক গণবেশে তিনটি ঘোষবাহিনী ছক্কড় গুঞ্জসহ সহ দুপুর আড়াইটায় পথ সঞ্চলন করে হাসনাবাদের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে আবার স্পোর্টিং এসোসিয়েশনের মাঠে ফিরে আসেন। সারা পথেই লালপাড় সাদা শাড়ি পরিহিতা কয়েকশো মা-বোনেরা পথসঞ্চলনকে স্বাগত জানান শঙ্খধবনি, উলুধবনি এবং পুষ্পবৃষ্টি সহকারে। এছাড়াও যাত্রাপথে অনেক জায়গাতেই সাধারণ পোষাকেও মা-বোনেরা সঞ্চলনকে স্বাগত জানান। এক অদ্ভুত দৃশ্য। এমনকী বহুস্থানে সংখ্যালঘু মা-বোনেরাও উৎসুক হয়ে সঞ্চলন প্রত্যক্ষ করেন।

বসিরহাট মহকুমার গ্রাম-গ্রাম থেকে সাধারণ মানুষ ৬২ টি বিভিন্ন গাড়ীতে করে সমাবেশে যোগ দিতে এসেছিলেন। তাঁদের অনেকেই নিজেদের পরিবারের ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদেরও নিয়ে এসেছিলেন। হাসনাবাদ শহরের নাগরিকরাও ভালো সংখ্যায় যোগ দিয়েছিলেন, সব মিলিয়ে এক আলোড়ন। উদ্বেল হিন্দু সমাজ। ১৩৫ টি গ্রাম থেকে স্বয়ংসেবকরা যোগ দেন। এছাড়া বসিরহাট জেলার ২৪২ টি গ্রাম থেকে হিন্দু সমাজের বহু ব্যক্তি এই সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, স্থানীয় কার্যকর্তারা বা অনুষ্ঠান সফল করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। সুদর্শনজীকে তাঁরা কথা দিয়েছিলেন— আপনি এলে এই জেলায় একশত শাখা এবং এক হাজার গণবেশ পরিহিত স্বয়ংসেবক থাকবে। দুটোই নির্দ্ধারিত মাত্রা পার করেছে শুনে সুদর্শনজীও আনন্দিত। শাখার সংখ্যা ১০৪ এসময়ে জেলাতে। মাঠের প্রবেশপথেই ছিল সিংহবাহিনী মা-দুর্গার বেশ বড় মূর্তি। অনুষ্ঠান শেষে স্বাগত সমিতির কার্যকর্তাদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন সুদর্শনজী।

স্বাগত সমিতির সভাপতি শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় সুদর্শনজীকে একটি শাল দিয়ে সম্বর্ধনা জানান হাসনাবাদ সঙ্ঘ কার্যালয়ে। শেখরবাবু গণবেশে পথসঞ্চলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। সভা পরিচালনা করেন জেলা কার্যবাহ সুকুমার বৈদ্য। সুদর্শনজীর কনভয় যখন কলকাতার পথে যাত্রা করে তখন রাত সাতটা বেজে গেছে। তখনও স্থানে-স্থানে মা-বোনেদের শঙ্খধবনি-উলুধবনি।

পরলোকে স্বামী বুদ্ধানন্দ

বাসুদেব পাল।। গত ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন হিন্দু মহাকাশ থেকে একটি উজ্জ্বল ধ্রুবতারা খসে পড়ল। দীর্ঘ সাতাত্তর বছরের একটি কর্মময় প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর জীবনের অবসান। প্রণবানন্দলোকে মহাপ্রস্থান করলেন শ্রীমৎ স্বামী বুদ্ধানন্দজী মহারাজ। বিগত দশ বছর যাবৎ তিনি ছিলেন বিশ্বব্যাপী কর্মযজ্ঞে সতত নিরত;সঙ্ঘের গৃহী, ব্রহ্মচারী, সাধু এবং সর্বসাধারণের আশা-ভরসা-প্রেরণার স্থল— সেক্রেটারি মহারাজ— সাধারণ সম্পাদক। সবাই শোকাকুল। তবে সাধুরা তো “দুঃখেষনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। আর তিনি তো শুদ্ধাত্মা— নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি...।

স্বামীজীর পূর্বাশ্রমের কথা প্রায় জানা যায় না। যেটুকু লোকমুখে শোনা, তা যৎসামান্য। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য স্বামী প্রণবানন্দের সঙ্গে কাজের, সাক্ষাৎ দর্শনের সান্নিধ্যের সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল তাঁদের মধ্যে মাত্র তিনজন বর্তমান ছিলেন— বর্তমান প্রেসিডেন্ট মহারাজ, স্বামী বুদ্ধানন্দ এবং স্বামী রামানন্দ (বাজিতপুরে থাকেন)। এখন রইলেন মাত্র দু’জন। স্বামীজী একবারই বিদেশে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিলেন।

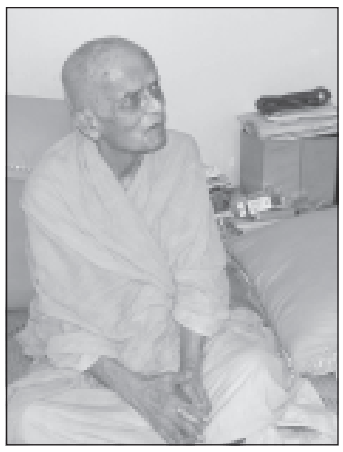

বুদ্ধানন্দজী মাত্র দশ বছর বয়সে আজ থেকে ৭৭ বছর আগে রাজশাহী ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ছাত্রাবাসে বিদ্যার্থী হয়ে এসেছিলেন। প্রবল বৈরাগ্য— সেবা এবং স্বামী প্রণবানন্দের সাহচর্য ছেড়ে আর কোথাও

গেলেন না, থেকে গেলেন। নিজেকে সমাজ-ধর্ম-দেশ-সংস্কৃতির রক্ষায় উৎসর্গ করে দিলেন। খুবই কম বয়স। এজন্য একটু দেরীতে ১৯৫২ সালে সন্ন্যাস দীক্ষা, নাম হয় স্বামী বুদ্ধানন্দ। যাঁরাই তাঁর ক্ষণিক সান্নিধ্যে এসেছেন, তারাই তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং অহৈতুকী করুণাঘন ভালোবাসার স্বাদ পেয়েছেন। শেষের দিকের কয়েক বছর শারীরিক কারণে চিকিৎসকদের নির্দেশে কথাবার্তা বলা নিয়ন্ত্রিত ছিল। পড়ে গিয়ে কোমর ভেঙে গিয়েছিল। তবুও সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের সঙ্গে প্রায় কুড়ি মিনিট বালিশে ঠেস দিয়ে বসে অনর্গল কথা বললেন। বারো খণ্ডে ‘শ্রীগুরুজী সমগ্র’ আশ্রমের জন্য তাঁর হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়ার জন্যই গিয়েছিলাম। তখন কী জানতাম ওটাই শেষ দেখা। ভক্তরা যা দিয়ে যেত উনি তা সযত্নে রেখে অন্যদের দিতেন।

তাঁরই আগ্রহে পরপর দুই সরসঙ্ঘচালক পূজনীয় রজ্জুভাইয়া এবং সুদর্শনজী বালিগঞ্জের প্রধান কার্যালয়ে গিয়েছেন। স্বামী বুদ্ধানন্দজী এবং অন্যরা তাঁদেরকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। তবে তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য দিক হলো— তিনি গুজরাটে হিন্দু সমাজ সংগঠন এবং সেবাকাজে কাটিয়েছেন বাইশ বছর। দীর্ঘ চল্লিশ বছর কাটিয়েছেন বিহার-ঝাড়খণ্ডে। সেখানে সঙ্ঘের ব্যাপক সেবা কাজ দাঁড় করিয়েছেন।

স্বস্তিকা পরিবারের পক্ষ থেকে এই মহাপুরুষকে জানাই শতকোটি প্রণাম।

পরলোকে নন্দরাণী পাল

আমাদের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক রমাপদ পালের মাতৃদেবী নন্দরাণী পাল গত ২৯ জানুয়ারি ভোরে নিজের

বাড়িতেই পরলোকগমন করেছেন। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় নববই বছর। তাঁর স্বামী স্বর্গীয় সুবোধ গোপাল পাল। চার পুত্র, এক কন্যা, পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনী তথা এক বিরাট পরিবারের বহু আত্মীয়-স্বজনকে তিনি রেখে গেছেন।

আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে হুগলী জেলার ঠাকুর ও মায়ের পদধুলিধন্য এই (তাজপুর গ্রাম) এলাকায় তাঁর পরিবারকে কেন্দ্র করেই সঙ্ঘকার্যের শুরু। দীর্ঘ এই কালখণ্ডে নেপথ্যে থেকে সঙ্ঘের কাজে তাঁর অবদানের কথা স্বয়ংসেবকেরা তাই চিরদিন স্মরণে রাখবে। স্বয়ংসেবকদের কাছে তিনি মা-ই ছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শক্তিপদ পাল কামারপুকুর খণ্ডের সঙ্ঘচালক। তাঁর নাতিরাও সঙ্ঘের সক্রিয় কার্যকর্তা। তাঁর মৃত্যুতে সঙ্ঘ পরিবারের সবাই শোকাহত।

পরলোকে অনিল কুণ্ডু

সকাল দশটা নাগাদ যখন তাকে ডাকা হলো তখন তিনি শান্তভাবে লেপমুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে। অনেক ডাকাডাকির পর

যখন সাড়া নেই তখন ডাক্তার ডাকা হলো। ডাক্তার এসে দেখে বললেন, উনি আর উঠবেন না। চিরনিদ্রায় শায়িত রইলেন। স্বস্তিকার দীর্ঘ চল্লিশ বছরের একনিষ্ঠ কর্মী তথা সঙ্ঘের উত্তর চব্বিশ পরগণার আগরপাড়া শাখার স্বয়ংসেবক অনিল কুণ্ডু। গত ৩১ জানুয়ারি তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। স্ত্রীসহ তাঁর এক কন্যা জামাই নাতি-নাতনিরা বর্তমান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। অনিলদা মাস্টারদা নামে পরিচিত ছিলেন।

স্বস্তিকার পক্ষ থেকে তাঁর মরদেহে মাল্যার্পণ করে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। সঙ্ঘ সহ স্বামী স্বরূপানন্দের অখণ্ডমণ্ডলীর সঙ্গেও তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন।

প্রয়াত জহর রক্ষিতের স্মরণসভা

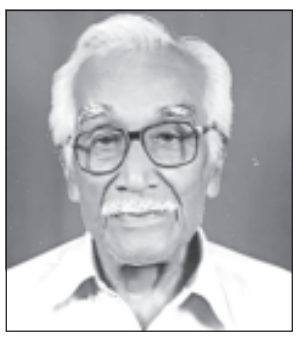

ওরা জানে গোয়াবাগান সি আই টি পার্কের উত্তর-পূর্ব কোণে গৈরিক ধবজ উঠবেই, সঙ্ঘের প্রার্থনা হবেই— কোনও কিছুর জন্য তার বদল হবে না। কেন? কেননা ওখানে জহরদা আছেন। জহরদা মানে জহর রক্ষিত। কলকাতার গোয়াবাগান সঙ্ঘস্থান আর জহরদা এক, আজও তাই আছে ওদের মনে, ভয়ে হোক ভালোবাসায় হোক— জহরদা আছেন সকলের মনে। তবে পরিবর্তন

একটা হয়ে গেছে গত ১৭ জানুয়ারি, রাত দশটা নাগাদ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে পরলোকে গমন করেছেন। স্ত্রীসহ তাঁর দুই পুত্র এক কন্যা এবং ভয়ে-ভালোবাসায় যারের মনে তিনি নিরন্তর থাকতেন, রেখে গেছেন তাদেরও। গত ২৪ জানুয়ারি কলকাতা কেশব ভবনে অনুষ্ঠিত জহরদার স্মরণ সভায় এভাবেই স্মৃতিচারণ করলেন গোয়াবাগান শাখায় স্বয়ংসেবকরা। জহরদা মানেই শক্তসমর্থ শরীর, দৃঢ়চেতা মন, আপোষহীন সঙ্ঘ তথা দেশপ্রেম, আর স্বয়ংসেবক তথা সমাজের আপতকালীন বিপর্যয়ের নির্ভরযোগ্য সঙ্গী। তাই সাধারণ মানুষের মনে সঙ্ঘ আর জহরদা ছিলেন সমার্থক।

শ্রীচৈতন্যের জীবনীনির্ভর ধারাবাহিক ‘মহাপ্রভু’

মিতদ্রু দত্ত

‘মেরেছো কলসীর কানা, তা বলে কি প্রেম দেবো না’— শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উক্তি এটি। মহান বিপ্লবী’ চৈতন্য মহাপ্রভু বারবার তাঁর লীলার মাধ্যমে বলেছেন, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। সেই তাঁকেই এবার ক্যামেরাবন্দি করলেন বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক সাহানা রায়। মোট ৫০ টি পর্ব নিয়ে নির্মিত হয়েছে ‘মহাপ্রভু’ নামের এ ধারাবাহিক। তিনি জানান, বিভিন্ন পুঁথিপত্র, বই, পত্র-পত্রিকা এবং ইতিহাসের পাতা থেকে তাঁর জীবনের নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে এই সিরিয়ালে। তাঁর শৈশব, কৈশোর, যৌবন এবং পরিণত বয়সকে তুলে ধরা হয়েছে সুনিপুণভাবে। মুখ্য চরিত্রে রূপদান করেছেন ব্রতীন চট্টোপাধ্যায়। তা ছাড়াও অভিনয়ে আছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রানী হালদার, অরিন্দম শীল, দীপঙ্কর দে, কল্যাণী মণ্ডল, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিতা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। সঙ্গীত পরিচালনায় আছেন পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী। সঙ্গীতে আছেন ইন্দ্রানী সেন, ইন্দ্রনীল সেন, শম্পা কুণ্ডু, স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। প্রাক্‌কথনে আছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, প্রণবেশ চক্রবর্তী, গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। সিরিয়ালটি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়নি।

শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে তরুণ প্রজন্মকে সচেতন করে তুলতেই প্রতিদিন থাকছে ক্যুইজ। থাকছে আকর্ষণীয় পুরস্কারও। যেহেতু অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্য নির্মিত হচ্ছে এ ধারবাহিক তাই প্রযোজনার দায়িত্ব কোনও ব্যক্তির নয়, এটির নির্মাণের ব্যয়ভার বহন করছে শ্রীচৈতন্য সেবা ট্রাস্ট (পুরী)। স্যুটিং চূড়ান্ত হলেও পুরীর কিছু দৃশ্য অন্তর্ভুক্ত করা হবে। প্রয়োজনে বাড়বে পর্ব সংখ্যাও। এজন্য ট্রাস্ট ও ওড়িশা সরকারের সাথে কথা চলছে। সমুদ্র সৈকতে স্যুটিং করা নিয়ে সামান্য জটিলতা ছিল। এখন আর নেই। শ্রীচৈতন্যের বাণী প্রতিদিন পর্দায় ফুটে উঠবে। উচ্চারিত হবে পবিত্র মন্ত্রও। তারপর হবে প্রাক্‌কথন। প্রতিদিন সোম-শুক্র একটি বেসরকারী বাংলা বিনোদন চ্যানেলে দেখা যাবে ধারাবাহিকটি। ৩০ মিনিটের স্লটে এমন অন্য ধারার ধারাবাহিক বহুদিন পর দেখতে পাবেন দর্শকরা। আগামী দু-মাসেই দেখা যাবে টিভির পর্দায়।

আসছে অন্য ধারার ধারাবাহিক ‘মহাপ্রভু জগন্নাথ’

মিতদ্রু দত্ত

মালব্যদেশের রাজা শ্রীবিষ্ণুর পরম ভক্ত ইন্দ্রদ্যুম্নের মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিল। আমোদ-প্রমোদ বিলাসিতায় রাজার যেন মোহভঙ্গ ঘটেছে। সারাক্ষণই তিনি সুন্দর একটা গন্ধ পান। কিসের সুবাস? কোথা থেকে আসে? রাজার প্রাণ ব্যাকুল। দু-নয়নে অশ্রুধারা। একদিন নীলমাধবরূপী ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে স্বপ্নে দেখলেন। নীলমাধব রাজার পূজা পেতে আগ্রহী। নীলমাধব স্বপ্নাদেশে জানান, তিনি অন্যত্র পূজিত হচ্ছেন। সেখান থেকে ইন্দ্রদ্যুম্ন নিয়ে এসে যেন পূজা করেন। কোথায় সেই স্থান যেখানে নীলমাধব পূজিত হচ্ছেন তা স্বপ্নে জানতে পারেননি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন। রাজার লোক-লস্করেরা বহু খুঁজেও সেই নীলমাধবের বিগ্রহ খুঁজে পান না। ব্যর্থ হয়ে সকলে ফিরে আসে। ফেরেন না শুধু বিদ্যাপতি। খুঁজতে খুঁজতে তিনি পৌঁছে যান শবররাজ বিশ্বসুন্দর বসুর কুটিরে। শ্রীবিষ্ণুর বালকবেশে বিদ্যাপতিকে পৌঁছে দেন বিশ্ববসুর কুটিরে।

বিশ্ববসুর আশ্রম এখন সন্তোষপুরে। সেই মাটির কুটিরে বিদ্যাপতির রূপ ধরে ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়ের প্রবেশ। গানের দৃশ্যটি টেক করা হচ্ছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়। বিশ্ববসুর কন্যা হয়েছেন রাজন্যা মিত্র। এখন তিনি জুঁই ফুলের মালা গাঁথছেন। ক্যামেরাটিকে রকেট লঞ্চারের মতো ধরে চিত্রগ্রাহক নয়ন দে কখনও বসে, কখনও আবার দাঁড়িয়ে ললিতার ভাবভঙ্গিমা ধরেছেন চূড়ান্ত পেশাদারিত্বে। কুটিরের সামনে চালাঘর। বালকবেশি শ্রীকৃষ্ণ হয়েছেন অষ্টম শ্রেণির ছাত্র সুমিত মজুমদার। এই বালকই ভাস্বরকে এনেছে ললিতা সকাশে। দুজনের সেই প্রথম দেখা। বিদ্যাপতি ললিতার যুগল মিলন হলো বলে। বিবাহের পরও বিদ্যাপতি কিন্তু সংকল্প থেকে বিস্মৃত হননি। মন ছুটে চলেছে নীলমাধবের উৎস সন্ধানে। সেই কুটিরে থেকে বিদ্যাপতি দেখেন বিশ্ববসু রোজ রাতে কোথায় যেন যান। ললিতাকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন বিশ্ববসু গোপনে নীলমাধবকে পূজা করতে যান। বিদ্যাপতি চমকে ওঠেন। তারপর অনেক অনেক ঘটনা। অবশেষে এলেন বৃদ্ধ অনন্ত বাসুদেব মহারাণা। তিনিই মূর্তি বানাবেন। শর্ত একটাই, ২১ দিনের আগে যেন কেউ মন্দিরের দরজা না খোলে। ইন্দ্রদ্যুম্ন অধীর। তিনি আর থাকতে পারছেন না। ধৈর্যহীন হয়ে আগেই দরজা খুললেন। দেখলেন মূর্তি। জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা, অসম্পূর্ণ। বৃদ্ধ শিল্পী উধাও। চিররহস্যে ঘেরা জগন্নাথ স্বামীর নানা ঘটনা ক্যামেরাবন্দি করলেন মনীশ ঘোষ। চিত্রনাট্যকার অমিত মৈত্র। সঙ্গীত মানব দেবের। প্রযোজনায় আছেন অশোক আরোরা। নিবেদক চ্যানেল ফোর। মহাপ্রভু জগন্নাথের অপার মহিমা বর্ণনা করবেন পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের প্রাক্তন প্রধান পুরোহিত শ্রীমহাপাত্র স্থানপতিজী মহারাজ।

তাঁর মূল্যবান বক্তব্য ও বাণী দর্শক সাধারণের জন্য দেখানো হবে ধারাবাহিক শুরুর আগে প্রথম এক সপ্তাহ। সম্পূর্ণ অবাণিজ্যিক এ ধারাবাহিক সংস্থার ব্যতিক্রমী প্রয়াস বলে দাবী উদ্যোক্তাদের।

কেরিয়ারের ঠিক-ঠিকানা

(১২ পাতার পর)

নয়।

পরীক্ষা কেন্দ্র ঃ আইজল, আলমোড়া, আম্বালা, রোটাক, কলকাতা, চেন্নাই, কোয়েম্বাটুর, দেরাদুন, গ্যাংটক, রাঁচি, কানপুর, গুয়াহাটি, মুম্বই, নিউ দিল্লি, শিলং, বিশাখাপত্তনম, কোহিমা, লাক্ষাদ্বীপ, জলন্ধর, জম্মু, জামনগর, যোধপুর, কোচি।

[প্রার্থী নিজের পছন্দ মতো যে কোনও কেন্দ্র বেছে নিতে পারেন, যদিও নৌবাহিনী যে কোনও কেন্দ্রে পরীক্ষা ফেলতে পারে।]

[আবেদনপত্র পাঠাতে হবে এই ঠিকানায় ঃ POST BOX No. 476, GOL DAK KHANA, GPO, NEW DELHI-11001.]

শব্দরূপ - ৫৭০

ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

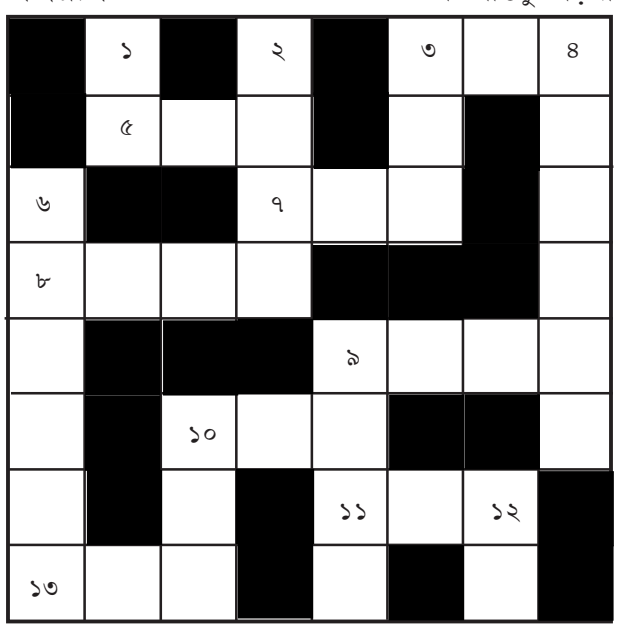

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ৩. বেগুন, প্রথম দুয়ে সমাচার, ৫. পাঁশ, ছাই, ৭. গরুর স্তন, ৮. পাতাল বিশেষ, অধঃপাত, নাশ, ৯. যোগসূত্র ও পাণিনিভাষ্য, রচয়িতা ঋষি, ১০. ময়ূরপুচ্ছ, ১১. শ্রমজীবী, ১৩. শসা।

উপর-নীচ ঃ ১. কড়া জবাব, তিরস্কার, মুখ, ২. কৃষ্ণ কর্তৃক নিতে চেদি দেশের রাজা, ৩. বিষ্ণুর পঞ্চ ম অবতার, ৪. তন্ত্রে ও যোগশাস্ত্রে উক্ত দেহের অভ্যন্তরে মূলাধার পদ্মে স্থিত শিবশক্তি, ৬. যে পরের সাহায্য প্রত্যাশা করে বা পরনির্ভর করে, ৯. নিষ্ফল শ্রম, ১০. পালকি, প্রথম দুয়ে ত্যাগধর্মের আদর্শ প্রাচীন ভারতীয় নৃপতি, ১২. শকুন্তলার পালক-পিতা স্বনামধন্য ঋষি।

● ৫৭০ সংখ্যার সমাধান আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ সংখ্যায়

পণ দেওয়া-নেওয়া অবৈধ অ-পত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া কি বৈধ?

শিবাজী গুপ্ত

নারসিস্যাস্ (Narcissus) ছিলেন পৌরাণিক গ্রীক যুবক। অতুলনীয় সৌন্দর্যের অধিকারী। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে নিজেই নিজের প্রেমে বিভোর হয়ে পড়েন। এবং সেই আত্মপ্রেমোন্মত্ততা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তাতেই সে মারা যায়। সেই থেকেই যারা নিজের প্রতিমূর্তি বা ছবিকে বেশি ভালোবাসেন তাদের নারাসিসাস্ বলা হয়। এই উৎকট ব্যাধিকে নারসিজম্ নাম দেওয়া হয়েছে।

ভারতের রেলমন্ত্রীকেও এই নারসিজম্ রোগে ধরেছে বলে মনে হচ্ছে। কারণ রাতভোর হলেই খবর - কাগজগুলিতে নিজের হাসি হাসি কচিকচি মুখের ছবি না দেখলে বোধ হয় মেজাজ হারিয়ে ফেলেন। রেলের আধিকারিকরাও বোধহয় রেলমন্ত্রীর এই আত্মপ্রীতির হদিস পেয়ে গেছেন। তাই যে কোনও নগণ্য ও তুচ্ছ ঘটনা উপলক্ষেই উদ্বোধন, উন্মোচন, শিলা পোতন, ফিতা কাটন বোতাম টেপন পর্দা খোলন— যাইহোক না কেন সাত ভাইয়ের চম্পা বোন হয়ে দেড় দুই পাতার বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়ে থাকে। কোনও এক অখ্যাত কাগজে কোনও দুর্মুখ কবির লেখা পড়েছিলাম:

বিসর্জনের বাজনা বাজে
বোধনের নাই ঠিক ঠিকানা।
কলকারখানার নাম গন্ধ নাই
উদ্বোধন হয় তাক্লিখানা।।

কেউ যদি বলেন কোনও ব্যক্তি যদি নিজের পাঁঠার লেজ ধরে কাটে তোমার মাথাব্যথা কেন রে বাপু? কারণ অবশ্যই আছে। কারণ এই অস্বাভাবিক হত্যা পশুক্লেশ নিবারণী আইনের আওতায় পড়ে। এখন মন্ত্রী যদি বলেন তিনি সবরকম আইন কানুনের ঊর্ধ্বে তা হলে অন্য কথা। তিনি অবশ্যই বলতে পারেন— সবার উপরে আমিই সত্য তাহার উপরে নাই। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ কৃষ্ণকান্ত রায়ের উক্তি কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে বলতে পারেন— আমিই মন্ত্রী, আমিই মিনিস্টার আমার কাছে আবার কোর্টকাছারি কি?

কবিগুরু এমন অনেক কথা বলে গেছেন যা বর্তমান যুগে অচল এবং অবাস্তর বলে মনে হয়। তিনি বলে গেছেন—

অন্যায় যে করে অন্যায় যে সহে:
বিধাতার অভিশাপ দোঁহা পরে রহে।

এখন কলিযুগের প্রাধান্যে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা যায়: অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, বিধাতার আশীর্বাদ দোঁহা পরে রহে। এককথায় মানুষের ন্যায় অন্যায় বোধটাই লোপ পেয়েছে, তার স্থান দখল করেছে তৃণমূল স্তর থেকে উত্থিত ও শাখাপ্রশাখায় প্রলম্বিত লোভী বৃক্ষ।

অনেক রকম ঘুষের কথা লোকের জানা আছে। কিন্তু বিজ্ঞাপন ঘুষ দেওয়া বিদ্যাটি আমাদের জানা ছিল না। এটি নতুন আবিষ্কার। এর আবিষ্কর্ত্রী হলেন ভারতের রেলমন্ত্রী। সংবাদপত্র নাকি জনমতের অতন্দ্র প্রহরী। অর্থাৎ তারা কখনো ঘুমায় না। তারা সদাজাগ্রত। তাদের ঘুমপাড়ানো ঔষধ খাইয়ে ঘুমিয়ে রেখেছেন রেল-মিনিস্টার। সে ওষুধ হলো বিজ্ঞাপন বটিকা। জেগে ওঠার চেষ্টা করলেই আধপাতা বিজ্ঞাপন। ভাতঘুমে ঘুমিয়ে থাকার জন্য একপাতা বিজ্ঞাপন বটিকা। গভীর ঘুমে ঢুলে পড়ার জন্য আড়াই ডোজ অর্থাৎ আড়াই পাতা বিজ্ঞাপন বটিকা। আধোঘুম আধো জাগরণের জন্য তিন ডোজ অর্থাৎ কিনা তিন পাতা বিজ্ঞাপন বটিকা। আর ঘুমে অচেতন হয়ে থাকার জন্য এক সঙ্গে চার ডোজ অর্থাৎ ৮ পাতার পত্রিকায় ৪ পাতা বিজ্ঞাপন বটিকা বিধেয়। তদূর্ধ্বে রেলী-সালসা প্রদেয়।

অনেক রকম ঘুষের কথা লোকের জানা আছে। কিন্তু বিজ্ঞাপন ঘুষ দেওয়া বিদ্যাটি আমাদের জানা ছিল না। এটি নতুন আবিষ্কার। এর আবিষ্কর্ত্রী হলেন ভারতের রেলমন্ত্রী। সংবাদপত্র নাকি জনমতের অতন্দ্র প্রহরী। অর্থাৎ তারা কখনো ঘুমায় না। তারা সদাজাগ্রত। তাদের ঘুমপাড়ানো ঔষধ খাইয়ে ঘুমিয়ে রেখেছেন রেল-মিনিস্টার। সে ওষুধ হলো বিজ্ঞাপন বটিকা। জেগে ওঠার চেষ্টা করলেই আধপাতা বিজ্ঞাপন। ভাতঘুমে ঘুমিয়ে থাকার জন্য একপাতা বিজ্ঞাপন বটিকা।

তারফলে তৃতীয় / চতুর্থ শ্রেণীর সংবাদপত্রগুলির বিকারদশা প্রাপ্তি ঘটেছে। পত্রিকা বেচে যাদের অন্নসংস্থান হোত না তারা এখন দু'বেলা গোস্ত-বিরিয়ানি ও চপ-কাটলেট সাঁটছে। বিজ্ঞাপন-বটিকা পানে তাদের এখন ঢুলু ঢুলু আঁখি। আটপৃষ্ঠা কাগজের আট পৃষ্ঠাতেই শুধু ডিডি ডিডি ডাক। চারদিকে শুধু ডিডিময়। ঘুমের ঘোরেও ম-ম-তা ম-ম-তা প্রলাপোক্তি।

রেল বিজ্ঞাপনের এই রমরমার বাজারে কে আর বাজার দর নিয়ে মাথা ঘামায়? তার চেয়ে গ্ল্যামার গার্ল-এর পেছনে পেছনে ছোটা অনেক বিনোদনের ব্যাপার, বস্তুত মজা। কর্তাভজা সংবাদপত্রগুলির আর কিই বা করার আছে। যেখানে হাত বাড়ালেই বিজ্ঞাপন, সেখানে মান সম্মান রীতিনীতির ধার ধেরে কি অশ্বডিম্ব হবে শুনি! মরুক দেগঙ্গার হিন্দু ভাঙুক মালদার ঠাকুরমূর্তি, লুট হোক মুর্শিদাবাদের দেবীর অলঙ্কার, পোড়ানো হোক কাকদ্বীপের মন্দির। বাংলার সংবাদপত্রের তাতে কি আসে যায়? তাদের ফাউল-কারি-সিদ্ধ হলেই হলো। (বঙ্কিমচন্দ্র)

অনেকে অনেক কিছুর জন্য জাত খোয়ায়। কেউ অভাবে কেউ স্বভাবে। তাতে অশ্লীল ইঙ্গিতপূর্ণ অনেক কারণ থাকতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞাপনের জন্য জাত খোয়াতে দেখা গেল বাংলার সংবাদপত্র জগতকে। এদের দশা বাড়ীউলি মাসীর হেফাজতে থাকা জাতভ্রষ্টা মেয়েদের মতো। এদের কলমে সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র নিয়ে বড় বড় কথা, মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে বাগাড়ম্বর শোভা পায় কি?

বিয়ের বাজারে পণ দেয়া-নেয়া নিন্দিত ও বিকৃত বলে গণ্য। অচল পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে আনুগত্য কেনা ও কারো ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করাকে কি ধন্য ধন্য বলে বাহ্‌বা দিতে হবে? একে বিউটি পার্লারে গিয়ে সুন্দরী সাজার কারসাজি বলে গণ্য হবে।

বুক স্টল উদ্বোধনের পর বক্তব্য রাখছেন প্রকাশ শর্মা। পাশে বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী ও অন্যরা।

বইমেলায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কলকাতা পুস্তক মেলায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্টল-এ রীতিমতো সবাইকে একসারিতে বসিয়ে সাজুয্যতা আনলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সর্বভারতীয় প্রচার প্রমুখ প্রকাশ শর্মা। গত ২৫ জানুয়ারি কলকাতা বইমেলায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ৪০৩ নম্বর স্টলের দ্বার উন্মোচন করতে এসে তিনি মন্তব্য করেন, কোর্টের রায়ে রামমন্দিরের আইনী স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। তাঁর মতে দেশজুড়ে হনুমৎ শক্তি জাগরণের প্রভাবেই দেশের মধ্যে শুভ পরিবর্তন শুরু হয়েছে। তারই পরিণামে কলকাতার বইমেলায় আয়োজকদের মধ্যে সু-বুদ্ধির প্রভাব পড়েছে বলে শ্রী শর্মার দাবি। প্রসঙ্গত, ইতিপূর্বে চেষ্টা করেও স্টল পাওয়া যায়নি।

এদিন সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালিয়ে এবং মন্ত্র উচ্চারণ করে মহানাম মঠের সন্ন্যাসী শ্রীমদ্ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী স্টলের উন্মোচন করেন। তিনি বলেন, সমাজের মধ্যে এই ধরনের পুস্তকের চাহিদা দীর্ঘদিন ধরেই চাহিদা রয়েছে। এবারের বইমেলায় তা বাস্তবায়িত হওয়ায় তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন।

প্রায় পঞ্চাশ-ষাটজন শুভানুধ্যায়ীদের উপস্থিতিতে সুসজ্জিত স্টলে এসে বাংলার বিশিষ্ট রাজনীতিক এবং লেখক অধ্যাপক তথাগত রায় জাতীয়তাবাদী বই কিনে স্টলে বই বিক্রির সূচনা করেন। গত ৩০ জানুয়ারি স্টল পরিদর্শন করেন পরিষদের আন্তর্জাতিক সাধারণ সম্পাদক ডাঃ প্রবীণ তোগাড়িয়া।

এবার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বুক স্টল শুরু হওয়ার পর রীতিমতো বাজারী পত্রিকায় আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছে 'হিন্দু' নামে স্টল, সাম্প্রদায়িক ব্যাপার-স্যাপার। এখানেই তাদের প্রতি প্রশ্ন – বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের সংগঠন। না তো তারা প্রতিবন্ধিত, না তাদের কাছে প্রতিবন্ধিত সামগ্রী রয়েছে।।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্টলে ভিড় হচ্ছে নজর কাড়ার মতো। প্রতিদিন স্টলে আসা মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। আগ্রহী মানুষেরা যেমন বিভিন্ন প্রকাশনার বই উল্টে-পাল্টে দেখছেন তেমনই ক্রেতার সংখ্যাও দিন দিন বেড়েছে। মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ দেখে স্বাভাবিক ভাবেই আয়োজকরা খুশি।

Swastika
7 February - 2011, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন আর এস এসের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যালয় কেশব ভবনে পতাকা উত্তোলন করছেন সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত।

গত ২৬ জানুয়ারি কলকাতার নর্দার্ন পার্কে কলকাতার স্বয়ংসেবকদের পারিবারিক সমাবেশে বক্তব্যরত আর এস এস প্রধান মোহনরাও ভাগবত।

স্বয়ংসেবকদের 'স্বয়ংসেবক' হয়ে ওঠার পেছনে পারিবারিক গুরুত্বের কথা বলে গেলেন মোহনজী। তারই টুকরো ঝলক।

গত ৩০ জানুয়ারি সুদর্শনজীর সফর উপলক্ষে হাসনাবাদের পথে স্বয়ংসেবকদের পথ-সঞ্চালন। সামনে বাইক-বাহিনী। ছবিগুলি তুলেছেন বাসুদেব পাল

গত ৩০ জানুয়ারি হাসনাবাদের স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের মাঠে সুদর্শনজীর সমাবেশে গণবেশে উপস্থিত স্বয়ংসেবকরা। উপস্থিত ছিলেন মা-বোনেরাও।

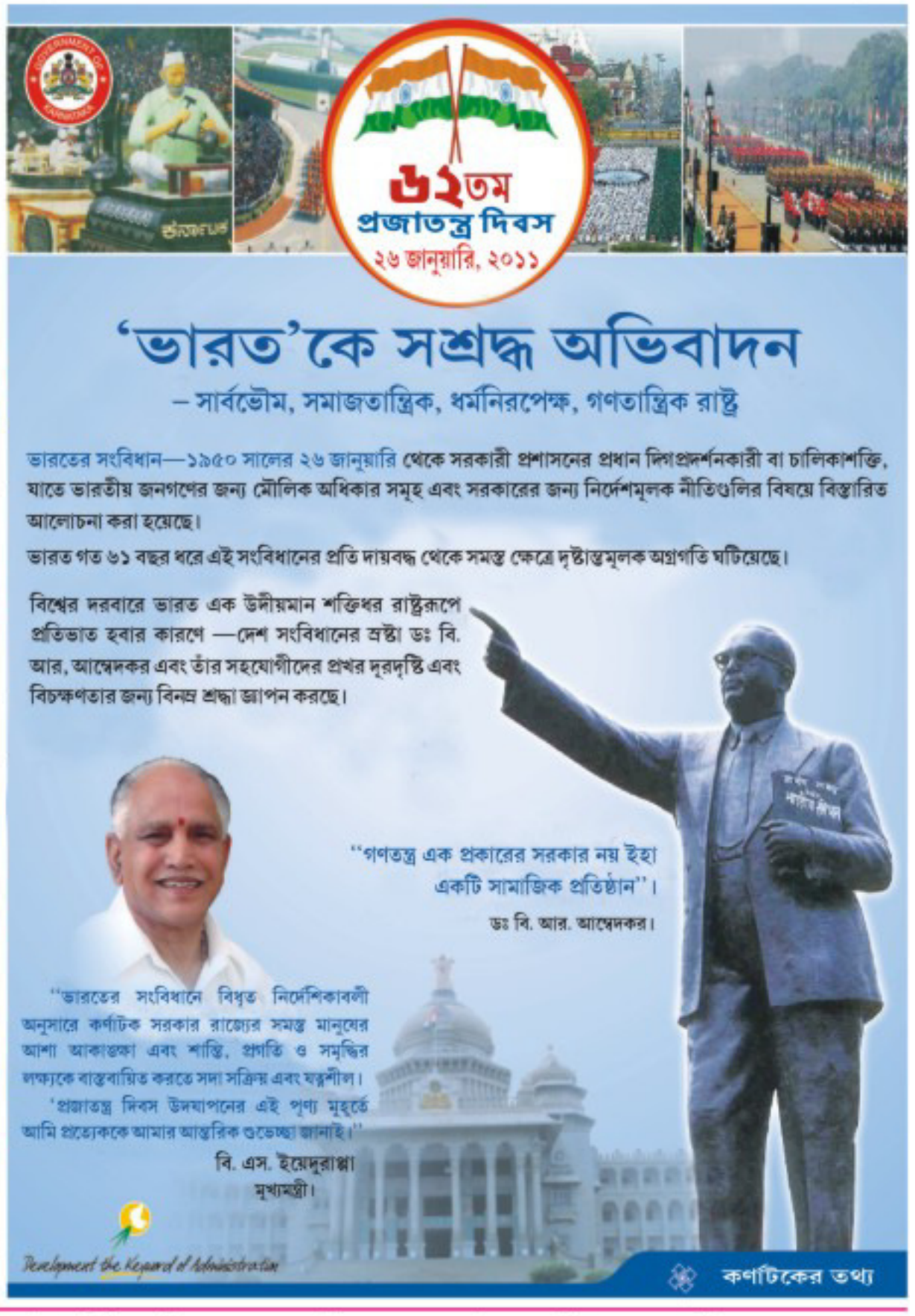

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রথেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক ঃ বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ ঃ সম্পাদকীয় - ৯৮৭৪০৮০৩৪৩, অফিস - ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১, বিজ্ঞাপন - ৯৮৭৪০৮০৩৪২, ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫,
e-mail : swastika5915@gmail.com / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com